ভুল।

১

সে যে এক ভুল—
সাধের শৈশব সেই
কিছু আজি মনে নেই,
সে আমি যে বাবা মা'র "স্নেহের মুকুল"!
ভূতলে নূতন আসা,
মরমে নূতন ভাষা,
কে জানে সে কি আনন্দ, কি সুখ অতুল,
আজি শুধু মনে হয়, সে যে এক ভুল!

২

সে যে এক ভুল—
যবে মিলি সখীগণে,
খেলিতাম এক সনে,
তটিনী বহি'ত যথা করি কুল কুল,
কচি বুক ভরা স্নেহে,
এক প্রাণ সব দেহে,
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথা সুখে ঢুল ঢুল!
আজি মনে হয় সুধু, সে যে এক ভুল!

৩

সে যে এক ভুল—
সন্ধ্যাকালে গলাগলি,
ঘরে আসিতাম চলি,
দু'পাশে হাসিত কত পুন্নাগ পারুল;
আকাশ দু'ফাঁক করি,
বুঝি বা দেখিত পরী
খুলি চারু নীল নেত্র, খুলি কালো চুল!
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

৪

সে যে এক ভুল,
যে দিনে বালিকা উষা,
পরিয়া মাণিক ভূষা,
দাঁড়াইলা স্বর্ণাচলে হয়ে অনুকুল;
যে দিনে দিনের শেষে,
পশ্চিমে ডুবিল হেসে,
সুন্দর তপন খানি রক্ত জবা ফুল!—
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

৫

সে যে এক ভুল,
যে দিনে সরসে শশী,
হাসিয়া পড়ি'ত খসি,
হেরিয়া তারকা মেয়ে হাসিয়া আকুল!
যে দিনে হাসির মেলা,
সংসার সুখের খেলা,
মানব সবাই যেন হাসির পুতুল!—
আজি মনে হয় সুধু, সে যে এক ভুল!

৬

সে যে এক ভুল,
কুসুমে সোণার দল,
অমৃতে মাখা'ন জল,
বাতাসে মন্দার গন্ধ ছুটিত বিপুল;
ছিল না যাতনা জ্বালা,
সারা ধরা সুধা ঢালা,
খুঁজে না পেতেম কোথা সৌভাগ্যের মূল?
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

* * *

৭

সে যে এক ভুল,
যেই দিন—অকস্মাৎ
সর্ব্বনাশ, বজ্রাঘাত!
কামনা, বাসনা, আশা, সহসা নির্ম্মূল!
সে যে কি দারুণ কথা,
সে যে কি অসহ্য ব্যথা,
বলিতে পারি না খুলে, পরাণ আকুল!
আজ মনে হয় যেন তাও এক ভুল!

৮

সে যে এক ভুল,
প্রতিজ্ঞা—সন্ন্যাসিবেশে,
বেড়াইব দেশে দেশে,
বিভূতি মাখিয়া দেহে, জটা ক'রে চুল;
পরিব বাঘের ছাল,
গলায় রুদ্রাক্ষ-মাল,
করে নেব কমণ্ডলু, শিবের ত্রিশূল!
আজ মনে হয় যেন, তাও এক ভুল!

৯

সে যে এক ভুল,
যায় যদি সাধ আশা,
কেন থাকে ভালবাসা,
কি নিয়ে মলয়া বহে না ফুটিলে ফুল?
এখনো কিসের ধ্যানে,
বেঁচে আছি ভাঙা প্রাণে,
এখনো কিসের ঘুমে আঁখি ঢুল ঢুল?—
আমার জীবনে ছাই আগাগোড়া ভুল!

১০

না না—
এতো নহে ভুল,
স্বরগে দেবতা তুমি,
আমি নর মর-ভূমি,
তবু মোর শিরে মাথা তব পদধূল!
তোমারি অমৃত গন্ধে,
এ শ্মশানে মহানন্দে,
কাটায়ে, দেখিব সুখে বৈতরণী-কূল,
এ মোর "জীবন্ত সত্য" কভু নয় ভুল!

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

উদাসীনের চিন্তা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতে পর)

চঞ্চলা কুষ্ঠাশ্রমের জন্য অলঙ্কারবিক্রয়ের টাকাগুলি পাঠাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এ আনন্দ চিরস্থায়ী হইল না। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে তাঁহার প্রতিবেশী শরৎ বাবুর কন্যার বিবাহোৎসব আরম্ভ হইল। তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এখন তাঁহার গাত্রে আর কোন অলঙ্কার নাই। হাতে কেবলমাত্র দুই গাছি শাঁখার বালা। বিবাহোৎসবে অনেক মহিলা উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই সাধ্যমত বেশ ভূষা করিয়া আসিয়াছেন।

কেহ কেহ ধার করিয়াও দেহ সুসজ্জিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। দাঁড়-কাক ময়ূরপুচ্ছে সুসজ্জিত হইয়া আপনাকে যেরূপ ময়ূর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল, সেইরূপ কোন কোন নিঃস্ব মহিলা প্রতিবেশিনীর বেশ ভূষা দ্বারা স্ব স্ব অঙ্গ সুসজ্জিত করিয়া ধনীর গৃহিণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী। আমরা তাহাদের কথা ছাড়িয়া দি। চঞ্চলা মহিলা-সমাজে তীব্র সমা-লোচনার বিষয় হইয়া পড়িলেন। যে সমাজে সকল লোকই বিষয়াসক্ত, ক্ষণস্থায়ী বেশ ভূষার জন্য লালায়িত, সে সমাজে বিষয়-বিরাগী হওয়া বিড়ম্বনা। মহিলাগণ চঞ্চলার বিষয়-বৈরাগ্য দেখিয়া নানা ভাবে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। চঞ্চলা ধর্ম্মরাজ্যের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র; জীবনে যে অবস্থা লাভ করিলে লোকে নিন্দা প্রশংসার উপরে উঠিতে পারে, তাঁহার সে অবস্থা লাভ হয় নাই। তিনি প্রশংসায় উৎফুল্ল এবং নিন্দায় বিষন্ন হইয়া থাকেন। সুতরাং যখন সমগ্র মহিলা-সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে নিন্দার তীব্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন, তখন তাঁহার যন্ত্রণা অসহ হইয়া উঠিল। তিনি এক কোণে গিয়া বসিলেন এবং অলক্ষিত ভাবে দুই চারি বিন্দু অশ্রু-জলও ফেলিলেন। তাঁহার মনে এখন শোচনার উদয় হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, অলঙ্কার পরি-ত্যাগ করিয়া বড়ই কুকাজ করিয়াছেন। তিনি তাদৃশ নিন্দাভাজন হইবেন পূর্ব্বে যদি জানিতেন, তাহা হইলে এমন কাজ কখনও করিতেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি একটা সৎকাজ করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার সে কাজের অনুমোদন করিবে এবং তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হইবেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত পণ্ড হইয়া গেল। তিনি প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দা কুড়াইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে এই যন্ত্রণার কারণ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। নির্ব্বোধ বালিকা অসাবধানতাবশতঃ যেমন পুতুলের আঘাতে ব্যথা পাইয়া রাগান্বিত হইয়া পুতুলকে দূরে নিক্ষেপ করে, চঞ্চলারও সেই দশা হইল। তিনি তাঁহার পরমহিতৈষী সন্ন্যাসী ঠাকুরকে হৃদয় হইতে দূরে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর যেরূপ দৃঢ়ভাবে তাঁহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া সহজসাধ্য হইল না। চঞ্চলা যতক্ষণ বিবাহোৎসবে ছিলেন, কেবল আপনাকে এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বিবাহের উৎসব কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া গেল, তাহার প্রতি তাঁহার বড় লক্ষ্য ছিল না। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া স্থির করিলেন যে, পুনর্ব্বার কতকগুলি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইবেন এবং লোকনিন্দার যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তিতে কাল কাটাইবেন।

বিবাহোৎসবের শেষে তিনি বাড়ীতে

প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার স্বামী বুদ্ধিমান্ লোক, তিনি চঞ্চলার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কারণ অনুমান করিয়া লইলেন—গৃহিণীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অধিকতর ব্যথিত হইবেন ভাবিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। যদিও চঞ্চলার স্বামী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় ক্রিয়ার অনুমোদন করেন নাই, তথাপি প্রাণসমা প্রেয়সীর প্রাণে আঘাত দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কোন কোন হৃদয়বিহীন স্বামী এতাদৃশ সময়ে স্ত্রীর যন্ত্রণার লাঘব না করিয়া বৃদ্ধি করিতেই আনন্দ অনুভব করেন—তাহার ভাঙ্গা হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া দুঃখের আগুন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। চঞ্চলার স্বামী সে উপাদানে গঠিত ছিলেন না বলিয়াই চঞ্চলা রক্ষা পাইলেন। স্বামী কারণ জিজ্ঞাসা না করিলেও চঞ্চলা তাঁহার মনোবেদনার সমস্ত কারণ স্বামীকে বলিলেন এবং সন্ন্যাসীর প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। চঞ্চলার স্বামী একজন ধার্ম্মিক লোক ছিলেন, তিনি সাধু-নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন "দেখ চঞ্চলা, নিজের কর্ম্মের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া ঠিক্ নয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার চুল দুইটী মাত্র চাহিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে সমস্ত গহনা বিক্রয় করিতে বলেন নাই। তুমি ভাল কাজ ব'লে তা কল্লে, এখন তাঁকে দোষী কর কেন? সাধুনিন্দা মহাপাপ, এমন কাজ কর্ত্তে নাই। আর কাল তুমি তাঁর সহিত দেখা কল্লে, তিনি হয়ত তোমার সকল শোক ঘুচাইয়া দিবেন। তাই কাল একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর।"

চ। আমি আর তাঁর ওখানে যাব না—বড় বিষম লোক, আবার কি কর্ত্তে বলেন তার ঠিক্ কি? তাঁর কথা ফেলাও ভাল নয়।

স্বামী। ধর্ম্ম করা সোজা কথা নয়। অনেক ছাড়্তে হয়, অনেক সহিতে হয়, অনেক সাধন কর্ত্তে হয়। তুমি প্রথমেই এত ভয় পাচ্ছ, তাহলে ধার্ম্মিক হবে কি করে? সাধু লোকেরা যা উপদেশ দেন, প্রাণপণে তা করা উচিত। তা কর্ত্তে যেয়ে লোকের মনের দিকে চাইলে চল্বে কেন? লোকের মনের দিকে চেয়ে কে কোন্ দিন ধর্ম্ম কর্ত্তে পেরেছে? তোমায় অনুরোধ করি, কাল একবার সন্ন্যাসী বাবাজীর কাছে যাও।

চ। আমার ত মন চায় না। তবে তোমার কথায় না হয় একবার যেয়ে দেখ্ব। কিন্তু তিনি যদি কোনও অসাধ্য সাধন ক'ত্তে বলেন, তা হইলেই ত নাচার।

স্বামী। সাধু মহাজনেরা ধর্ম্মার্থীদিগের শক্তি বুঝিয়াই সাধন দেন, শক্তির অতিরিক্ত কিছু কর্ত্তে বলেন না। তবে কেহ যদি রাতারাতি বড়লোক হ'তে ইচ্ছা করে, তা হলে উপদেষ্টার কোনও দোষ নেই—শিষ্যেরই দোষ। তুমি একদিনেই সমস্ত বিষয়াসক্তি দূর কর্ত্তে চেয়েছিলে। কাজেই তোমার কষ্ট হচ্চে। ধর্ম্মরাজ্যে জোর করে কোনও কাজ হয় না।" মাথায় কাল চুল যেমন জোর করে শাদা করা

যায় না, বয়স হ'লে আপনিই শাদা হয়, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও সাধন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চল্‌তে হয়, একবারে লাফ দিয়ে দুই চারি ধাপ পার হওয়া যায় না। স্বামীর যুক্তি চঞ্চলার নিকট খুব সারগর্ভ বলিয়া অনুমিত হইল। তাঁহার মনে যে শোকতরঙ্গ উঠিয়াছিল, স্বামীর সদুপদেশে তাহা প্রশমিত হইল। তিনি পরদিন পুনর্ব্বার সন্ন্যাসি-দর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন, সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার যে বিরক্তির ভাব ছিল, তাহা দূরে তাড়াইয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর সাধুদর্শনে গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)।

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

(৩৬৫ সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর)

যদি কোন ব্যক্তি এই নীরস প্রবন্ধ পাঠের কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, অবশ্যই তাঁহার স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে স্থলে মৃত্তিকার প্রকারভেদ লিখিত হইয়াছে, তথায় "লোণা সোরা" ও "লোণা কোটা" নামক দুই প্রকার মৃত্তিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিমাণে লবণ ও সোরার মিশ্রণ থাকাতে ঐ দুই প্রকার মাটী নিতান্ত অনুর্ব্বর হইয়া আছে। কিন্তু প্রকৃতির শক্তিপ্রভাবে ঐ দ্বিবিধ ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্যাদি ফসল হইয়া থাকে।

আর দুই প্রকার মাটীর কথা বলিতে পারিলেই এ প্রবন্ধের মৃত্তিকা-প্রকরণ এক প্রকার শেষ হয়। ঐ দুই প্রকার মাটীর নাম, "দো-আঁশ মাটী" ও "ভিটামাটী"। ঐ দুই প্রকারই মিশ্র মৃত্তিকা। কিন্তু উভয়ে মিশ্র মৃত্তিকা হইলেও উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে; কারণ সমান সমান বস্তুর মিশ্রণে ঐ দুই বস্তু উৎপন্ন হয় নাই। বিবিধ উদ্ভিজ্জের বিনাশাবশেষ, চূর্ণ, ভস্ম, বালুকাদি পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া দো-আঁশ মাটীর সৃষ্টি হয়। এই মাটী অতিশয় উর্ব্বরা। ইহাতে কি আশু, কি হৈমন্তিক, কি ঝাটী, সকল প্রকার ধান্যই উত্তমরূপ জন্মে। তদ্ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার তরু, লতা ও গুল্মের পক্ষে এই মাটী বিশেষ উপকারক। বিশেষতঃ নীল, তুঁতে, হরিদ্রা, আলু প্রভৃতি শিল্প-সহায় ও লাভজনক ফসল এই মাটীতে উৎকৃষ্টরূপ জন্মে। দেশভেদে এবং উপাদান পদার্থের ভিন্নতা বশতঃ ঐ মৃত্তিকার শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ হইয়া থাকে।

"ভিটামাটী", "দো-আঁশ" মাটী অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা, ইহার উপাদানও বিবিধ। গ্রাম, নগরাদি বিজন ও বিধ্বস্ত হইয়া ভিটামাটীর উৎপত্তি হয়। মনুষ্যের ব্যবহৃত বিবিধ পদার্থই উহার উপাদান ঃ—যেমন খড়, পোয়াল, ভুষি, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, ভস্ম, গোবর, ঘুঁটে, তুঁষ ইত্যাদি। ইহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ, লতা, শাক, সব্জী উত্তমরূপে জন্মে। বিশেষতঃ তামাক ও সর্ষপ ভিটামাটীতে যেমন হয়, তেমন আর অন্য কোন ভূমিতে হয় না। কিন্তু ভিটা-মাটীতে কোন প্রকার ধান্যই ভাল হয় না। আশু ধান্য কিছু হইলেও আমন আদৌ হয় না।

যত প্রকার মাটীর কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত হিমালয়ের অধিত্যকা, উপত্যকা, ও তলদেশে আর কয় প্রকার মৃত্তিকা আছে। এই সকল মৃত্তিকার সহিত পূর্ব্বোক্ত কোন মৃত্তিকার প্রায় সাদৃশ্য নাই। কেননা হিমালয় যেরূপ মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, সেরূপ মাটী পর্ব্বতের কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। কারণ বহু পূর্ব্বকালে বহুসংখ্যক আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা হিমালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, অদ্যাপি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দর্শন করিলে তাহার নিদর্শন প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং হিমালয়ের কি অধিত্যকা, কি উপত্যকা, কি তলদেশ সকল স্থানই দগ্ধ মৃত্তিকায় পূর্ণ এবং ঐ মৃত্তিকার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ও বালুকা মিশ্রিত আছে। এজন্য ঐ মাটীতে কিছুমাত্র আটা নাই; সর্ব্বদাই শিথিল ও তাপশোষক। কিন্তু উর্ব্বরতাবিষয়ে অন্য কোন মৃত্তিকাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। কোন কোন পার্ব্বতীয় উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকাভেদ-প্রকরণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও, আমরা মনে করি, অস্মদ্দেশীয় কৃষিকার্য্য বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে।

ধান্যের প্রকারভেদ—আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ধান্য সামান্যতঃ তিন প্রকার—আশু, হৈমন্তিক বা আমন ও ঝাটি। সচরাচর বৈশাখ মাসে যে ধান্যের চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়া ভাদ্র মাসে শেষ হয়, তাহাকে আশু বা আউস কহে; জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়ে যাহার চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়া অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে শেষ হয়, তাহাকে হৈমন্তিক বা আমন কহে; এবং আশু ও হৈমন্তিকের মধ্যে কার্ত্তিক মাসে এক প্রকার ধান্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কার্ত্তিকে ঝাটি কহে। তদ্ভিন্ন বোরো, চালি, কাউন, চিনে প্রভৃতি কয়েক প্রকার ধান্য আছে, তাহা পৃথক্-জাতীয় ধান্য নহে। তাহাদের কোনটী আশু, ও কোনটী আমনের অন্তর্গত। কৃষকেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন, একাধিক * সহস্র প্রকার ধান্যের নাম আছে। এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। যদিও আমরা অধিকসংখ্যক ধান্যের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তথাপি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা অবশ্যই এই স্থলে বলিব।

* কেহ কেহ বোরো ও জলিকে পৃথক্ দুই প্রকার ধান কহিয়া থাকেন।

আমরা বঙ্গবাসী, ধান্যই আমাদিগের জীবন-রক্ষার প্রধান সামগ্রী, এজন্য তাহার নাম শুনিলেও যেন কতকটা ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। অতএব এক্ষণে আমরা ধান্যের নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলাম। আশু ও আমন ধান্যের মধ্যে কয়েকটী উপবিভাগ আছে ঃ—যথা ছোট্‌না আশু ও বরাণ আশু। আমন দ্বিবিধ ; যথা রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে। এই বাগ্‌ড়ে আবার দুই প্রকার—ছোট্‌না বাগ্‌ড়ে ও বরাণ বাগ্‌ড়ে। * আশু ধান্যের মধ্যে সূর্য্যমণি, খুক্‌নী, মধুমালতী, আগুন-বাণ, সন্ধ্যামণি, ফেব্‌রি, লোহাগজাল, দলকচু, তুলসীমঞ্জরী, পরাক্ষী, কাজলা, ঘুড়ে, পিপ্‌ড়েশার, খেজুরছড়া ও চন্দ্রমণি প্রধান। ছোট্‌না আশুর মধ্যে কেলে, মুদ, তানরেঢেঙ্গা, ছোটকুমারী, ঢেঙ্গা-কুমারী, নড়াই চামরে, সাঁজাল, নেড়ামুদ, মাণিকমুদ, পূর্ণিকেলে, আশুলঘু, কাল-মাণিক, কাদাচাপ, গুড়কপিলে ইত্যাদি প্রধান। আশু ধান্যের মধ্যে সূর্য্যমণি, খুক্‌নী, চন্দ্রমণি, ও মধুমালতী এই কয়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আশু ধান্যের মধ্যে কোন্‌টীর কি বিশেষ গুণ আছে, কৃষকের তাহা জানা থাকিলে অনেক উপকার হয়। সূর্য্য-মণি ধান্য ফলে বেশি, এবং কিছুদিন জল না পাইলেও তাহার বড় ক্ষতি হয় না। মধুমালতী—অধিক উত্তাপ সহিতে পারে, এজন্য প্রস্তর ও বালুকামিশ্রিত ভূমিতে উহার চাষ আবাদ চলিতে পারে। চন্দ্রমণি ধান্যের ফলন অধিক বটে ; কিন্তু উহা পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়। মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতেই যে সকল কৃষকের ঘরের ভাত ফুরাইয়া যায়, তাহারাই প্রায় আউশ ধান্যের চাষ করে ; কেননা শীঘ্র এক মুষ্টি ধান্য পাইয়া উপকৃত হইবে। সুতরাং যে ধান বিলম্বে পাকে, তাহাদের পক্ষে সে ধানের আবাদে সুবিধা হয় না। সন্ধ্যামণি ও ফেব্‌রি, এই দুই প্রকার ধান অতি শীঘ্র পাকে ; এই জন্য কৃষকেরা নির্ভাবনায় চরভূমিতে ঐ দুই প্রকার ধানের আবাদ করিতে পারে। নদীর বার্ষিক প্লাবনে ধান ডুবিয়া যাইবার শঙ্কা থাকে না, অথচ চরভূমির আবাদে কৃষকের বিলক্ষণ লাভ আছে ; কেননা পললের সংসর্গে চরভূমি অতিশয় উর্ব্বরা হয় ; সুতরাং সেখানকার ধান অতিশয় ফলশালী হয়। দলকচু মেটেল ভূমিতে জন্মে। কিন্তু মেটেল ভূমির ধান পাকিতে কিছু বিলম্ব হয়। ছোট্‌না আশুর মধ্যে "ষেটে" নামক এক প্রকার ধান আছে, তাহা ষাইট দিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে।

কার্ত্তিকশাল, ইহার প্রকৃত নাম কার্ত্তিক-শালী। নামানুসারে উহাকে আমনের মধ্যে ধরা যায়, এবং উহার আবাদও আউশ অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে পাকে বলিয়া নাম কার্ত্তিক-শালী। কার্ত্তিকে ঝাটিও ইহারই নামান্তর। "কেশেফুল" নামক এক প্রকার ধান্য আছে, তাহাও কার্ত্তিকশালীর অন্তর্গত।

যে বৎসর অধিক বন্যা হইয়া আমন ধান

---

* রাঢ়িও দুই প্রকার, ছোট্‌না ও বরাণ।

ডুবিয়া ও পচিয়া এককালে নষ্ট হইয়া যায়, সেই বৎসর কৃষকেরা বোরো ধানের আবাদ করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়; কারণ বোরো ধান কাদা জলে জন্মিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ ধানের ন্যায় ফসল আর কোন ধানের হয় না। বিঘা প্রতি ১৬/০ ষোল মণের অধিক ফলন হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে ভূমিতে আইল বাঁধিয়া জল ধরিতে হয় এবং সেই জলে কাদা করিয়া বোরো রোপণ করিতে হয়। আমনের আবাদের বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতেই বোরোর আবাদ হইয়া থাকে। বোরো মাঘ মাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। আবার সেই ভূমিতে চাষ দিয়া রীতিমত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে আবাদ হইয়া থাকে। বোরোর গোড়া, পাতা, ধান পচিয়া ও মৃত্তিকাসাৎ হইয়া আমনের বিশেষ সাহায্য করে। ফলতঃ পূর্ব্ব বৎসরের বর্ষা-বিনষ্ট হৈমন্তিকের ক্ষতি বোরো দ্বারা অনেকটা পোষাইয়া যায়।

মাঘ ফাল্গুন মাসে নদীর জোয়ারের জল যতদূর উঠে এবং ভাঁটার সময় যতদূর নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমার মধ্যে "জলি" ধানের আবাদ করিতে হয়। বসন্ত-বায়ুর স্পর্শ ভিন্ন "জলি" ধানের গাছ তেজস্বী হয় না, এজন্য মাঘের শেষ-ভাগে বা ফাল্গুনের প্রথমে একটা মরা কটাল দেখিয়া সেই পলির কাদার উপর জলির বীজ বপন করিতে হয়। উহা পৃথক্ এক প্রকার ধান নহে; ছোট্‌না আশুর অন্তর্গত এক প্রকার ধান্যবিশেষ। তবে উহা জলের মধ্যে জন্মে বলিয়া উহার "জলি" এই নাম হইয়াছে। উহার চাষ আবাদে ব্যয়ও অধিক নাই। ধান্য-বপনকালে যে কিছু পরিশ্রম ও ব্যয়, তদ্ভিন্ন ধান কাটার মধ্যে আর কিছুই করিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ ধান পাকিয়া উঠে।

বরাণ আশুর মধ্যে আরও কয়টী নাম আমরা যথাস্থানে ধরিতে ভুলিয়াছি, এজন্য এই স্থানে তাহাদের উল্লেখ করিয়া আশু-প্রকরণ শেষ করিব:—যথা সর্ব্বভোগ, কপিলেশ্বর, চন্দ্রমণি, সূর্য্যমণি, কবুতর-ঝুড়ি, পিপ্‌ড়েকেলে, লক্ষ্মীজটা, সরু চামরে, দুধচামরে, বেণফুলি, পুটেগজাল, বেগুনবীচি, কালকচু, জগদ্দুর্লভ, ভুবনদুর্লভ, লোহা-গড়, ঘৃতকাঞ্চন, চিঙ্গড়েশাল ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীজটা, পুটেগজাল প্রভৃতি কয়েক প্রকার ধান বড় মোটা।

এক্ষণে আমরা হৈমন্তিক বা আমন ধানের কথা বলিব। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহা প্রথমতঃ রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার পর রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে আবার ছোট্‌না ও বরাণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ছোট্‌না রাঢ়ির প্রকার অধিক নহে। অধিক না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ জল ভিন্ন আমন ধান হয় না। ধানগাছের দৈর্ঘ্য পরিমাণ অল্প হইলে উহা জলময় হইয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এজন্য সামঞ্জস্য-বিধায়ক জগদীশ্বর উহার সংখ্যা অল্পই করিয়াছেন। এই ধান্যের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিমাণ-

বিষয়েও তাঁহার অতুল শিল্প-নৈপুণ্যের ভূরি নিদর্শন দৃষ্ট হয়। আমরা প্রসঙ্গতঃ তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। লঘু, কেলেন্দি, রোয়াকেলে, নিনামা, মৌল ইত্যাদি ছোট্‌না রাঢ়ি।

বরাণ রাঢ়ি ধান বহুতর। বেণাফুল, বাঁশমতী, রামশালী, চামরমণি, পেশোয়ারি, পাটনাই হুড়ো, পাতরকুচি, লোনা, করিমশাল, খাণ্ডবশাল, ঝিঙ্গেশাল, বনগোঁটা, কৈযোড়, কেলে, উড়কি, ছিলেট, কনকচুর, পরমান্নভোগ, বাঁশকাটা, ভাদাপাস্তী, মেথি, মেনকি, খিকলা, কেউটেশাল, পাদসাভোগ, হরিনারায়ণ, মাঠচাল, পুদিনী, পানত্রাস, কালহানা, মুগী, পূরবী, রাংমৌলা, বৌনাগরা, কৃষ্ণচূড়া, গুড়কচু, শালকেলে, সফেদকলমা, হরিণখুরী, কদমশালী, কুসুমশালী, সর্ব্বভোগ, রাজভোগ, বাঁশফুলী, হেতেমাগুড়, পোকা এইগুলি প্রধান।

ছোট্‌না বাগ্‌ড়ে আমন—যথা কেঁকো, ডেঙ্গাকুড়ি, কার্ত্তিকে ডেপু, হুমনাড়ী, কুঁচে, মেঘলাল, দেবমুনি, আয়দা, আঁধারমাণিক, ডহরনাগরা, এইগুলি প্রধান।

বরাণ বাগ্‌ড়ের মধ্যে কৃষ্ণকলি, মুক্তাহার, ছোটদীঘে, বড়দীঘে, নেতা, ধনি, পিস্তরাজ, কেয়ারশালী, কুল আমলা, পুদি, কলমা, ন্যাপো, লালকানাই, মেহেরকল, হাসবত, কালবয়রা, এইগুলি প্রধান।

রাঢ়ি ও বাগ্‌ড়ে এই দুই প্রকার আমনের মধ্যে যে দুই দুই প্রকার ভাগ আছে, সেই সকল ভাগের অন্তর্গত কতকগুলি করিয়া ধান্যের নাম করা গেল। এক্ষণে ঐ সকল ধান্যের মধ্যে কোন্ ধানের কি বিশেষ গুণ আছে, তাহার আলোচনা করা যাইবে। বরাণ রাঢ়ির মধ্যে যে সকল ধানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণচূড়া, রামশালী, চামরমণি, বাঁশমতী, বেণাফুল, পাদসাভোগ ইত্যাদি কতকগুলি সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট। উহাদিগের চাউল অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। সে চাউলের অন্নভোজন সঙ্গতিশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের ভাগ্যে ঘটে না। কৈযোড় ধানের ফলন খুব বেশি, এজন্য উহার আবাদে কৃষকের বেশ লাভ হয়। উড়ে, কনকচুর ও মেনকি, এই ত্রিবিধ ধান্যে খৈ হয়, এবং উহাদিগের ফলনও অধিক। খইয়ের ধানের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক এবং উহার ফলনও অধিক। এজন্য ঐ ধানের চাষেও কৃষকের লাভ আছে। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ ধানই,—বিশেষতঃ কনকচুর অত্যন্ত নাবি, মাঘ মাসের পূর্ব্বে পাকে না। উড়ে ধান অধিক ফলে বটে; কিন্তু উহা সংগ্রহ করা কঠিন। কারণ উহা পরিপক্ব হইবামাত্র গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, তখন ভূমি-বিক্ষিপ্ত ও মৃত্তিকাসহ মিলিত ধান-সঙ্কলন দুরূহ ব্যাপার বোধ হয়। উড়ে ধানের আবাদ বিষয়ে ইহা একটী ক্ষুদ্র বিপদ। আমাদের পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা বরাণরাঢ়ি ধান্যের মধ্যে "পোকা" নামক এক প্রকার ধানের নাম করিয়াছি। আমাদের দেশে ঐ ধানের চাষ আবাদ বৃদ্ধি পাওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়। খুলনা

জিলার অন্তর্গত দৈতে পরগণার কোন কোন স্থানে এবং আসাম অঞ্চলের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে ঐ ধান্তের আবাদ হইয়া থাকে। যে ২।১টী কৃষক উহার চাষ আবাদ করিয়া থাকে, তাহারা স্ব স্ব জমীদারকে এবং আত্মীয় কুটুম্বকে উহা উপহার দেয়; বোধ হয়, আদৌ বিক্রয় করে না। ঐ ধানের চাউল, ভ্রমণকারী-দিগের বিশেষ উপকারী, কারণ উহা হইতে অন্ন প্রস্তুত করিতে অগ্নিপাকের প্রয়োজন হয় না। চিঁড়ে, মুড়ি, খই, ছাতু ইত্যাদিতে কিঞ্চিৎ জল সংযোগ করিলে তাহা যেমন সুখ-খাদ্যরূপে পরিণত হয়, পোকা ধান্তও জলসিক্ত হইলে কিয়ৎ-ক্ষণের মধ্যে অগ্নিপক্ক সুসিদ্ধ অন্নরূপে পরিণত হয়। যাঁহারা নিত্য অন্নাহার করিয়া থাকেন, একদিন অন্নাহার না ঘটিলে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ক্লেশ হইয়া থাকে। তবে পথে ঘাটে বিদেশে অন্নের অভাব বশতঃই অন্যবিধ আহার করিতে বাধিত হইয়া থাকেন। পাকাদি ক্রিয়া-সম্পাদন সকল স্থানে সকলের পক্ষে সহজ নহে। যদি পথিকগণের নিকট কিছু কিছু এই চাউল থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বড় সুবিধা হয়, অনায়াসে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমাদের দেশে এই "পোকা" ধানের চাষই বৃদ্ধি পাইলে বড় ভাল হয়। (ক্রমশঃ)

বিগত শতবর্ষে রমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬৫ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ যুগের শেষভাগে লর্ড ল্যান্সডাউন মহোদয়ের শাসনসময়ে ভারতবর্ষে বাল্য-বিবাহ-নিষেধক আইন পাস হয়। এই কার্য্যে অনেকের বিবেচনায়, শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের সম্ভ্রমের কতকটা হানি হইয়াছে। তথাপি ভারতবাসিনীদিগের প্রতি রাজার যে বিশেষ অনুগ্রহ এ আইনেও তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এইরূপে জগদীশ্বরের কৃপায়, ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে, এবং দেশীয় ও বিদেশীয় নারীহিতৈষিগণের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে গত শত বৎসরে ভারতমহিলা-দিগের অবস্থা অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বহুতর কলেজ স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রায় প্রতি জেলায় স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সভা সমিতি হইতেছে। উত্তরপাড়া হিতকারী, মধ্য-বাঙ্গালা-সম্মিলনী, শ্রীহট্ট-সম্মিলনী, যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী, বিক্রমপুর হিতসাধিনী, ফরিদপুর সুহৃৎসভা প্রভৃতি সভা কর্ত্তৃক রমণীগণের লেখা পড়া, শিল্প ও কারুকার্য্য, গার্হস্থ্য নীতি অধিকতর উৎসাহিত হইতেছে। ভারতমহিলাদিগের অনেকেই সত্যধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার ফলস্বরূপ ভারতে পণ্ডিতা রমাবাই, ডাক্তার আনন্দী

বাই, বিছষী শ্রী বাই ও অনসূয়া বাই প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণ, কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, এম্, এ, ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্, বি, কুমারী, কামিনী সেন, বি, এ, কুমুদিনী কাস্তগিরি, বি, এ, প্রভৃতি বঙ্গ-মহিলাগণ বিদ্যাবত্তায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দুইজন পারসী মহিলা—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একজন ডাক্তার, আর একজন ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, আলো ও ছায়া রচয়িত্রী প্রভৃতি বঙ্গবাসিনীগণ সাহিত্যক্ষেত্রে "প্রথম শ্রেণীর লেখিকা" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মহাত্মা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশে বিধবাশ্রম, পণ্ডিতা রমাবাই পুনাতে "শারদা-সদন" আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনাথা বিধবাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এক এক জন মহাপ্রাণা রমণীর প্রধান উদ্যোগে ও সহায়তায় কলিকাতায় "অনাথ-নিবাস" ও "দাসাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে। একজন মহদাশয়া রমণী ভারতের পতিতা অবলাদিগকে ধর্ম্মপথে লইবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতের সুশিক্ষিতা নারীগণ, এইরূপে প্রকৃত জীবন লাভের পরিচয় দিতে সক্ষমা হইয়াছেন। সাধারণ মহিলাগণ লেখা পড়ার সাহায্যে দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব, ধোপার হিসাব, গোয়ালার হিসাব, শিশুদিগকে প্রথম শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন। বঙ্গভাষায় ভূগোল, খগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়াতে, অনেক মহিলা সে সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। এ যুগে ভূত প্রেতেরা আর কথায় কথায় স্ত্রীজাতির উপরে উপদ্রব করিতে পারে না, সে সকল "কল্পিত কথা" বলিয়া বিজ্ঞান প্রমাণ দিতেছে। মৃতবৎসা রমণী আর পরের সর্ব্বনাশের চেষ্টা না করিয়া শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত ঔষধ ও নিয়ম দ্বারা জীববৎসা হইতে পারিতেছে। পতি-বশীকরণ জন্য ভার্য্যাকে আর ঔষধ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। বহুবিবাহ পরিত্যক্ত হওয়াতে স্বামী সহজেই ভার্য্যার বশীভূত হইতেছেন। রুচির উন্নতির সহিত রমণীগণ অনেকে বিশ্রী ঠাট্টা তামাসা, কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠ ও অসভ্যতাপূর্ণ অন্যান্য আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্রের পরিবর্ত্তে অনেক নব্যা মহিলা (বস্ত্রের সহিত) সেমিজ, জ্যাকেট, বডী প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছেন। রূপার গহনার পরিবর্ত্তে সোণার গহনা, এবং ঢেঁড়ি, পাশা, নথ, মাদুলি, বাউটী, পৈঁছে প্রভৃতি গহনার পরিবর্ত্তে কটক, ঢাকা ও কলিকাতার খ্যাতনামা কারুদিগের কৃত চিক্, চেন হার, কাণ, ইয়ারিং, অনন্ত, যশম, চুড়ি, বালা প্রভৃতি সুদৃশ্য ও সুন্দর নামযুক্ত গহনা সকলও বাহ্যিক রুচির উন্নতির পরিচয় দিতেছে; স্ত্রীজাতির চিন্তাশীলতা ও হিতাহিতবিচারশক্তি ক্রমশঃ

পরিস্ফুট হইতেছে। বালিকাবিবাহ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। বালবিধবাদিগের পুনঃ-সংস্কারের পথ ক্রমশঃই উন্মোচিত হইতেছে; প্রাপ্তবয়স্কা বিধবাদিগের অনেকে শরীর-কৃচ্ছ্রতার বাড়াবাড়ি অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন। বহুবিবাহ-নিবারণ-ফলে দাম্পত্য-প্রেম গভীর ও দৃঢ়তর হইতেছে। সমাজে রমণীগণ পবিত্রতা, কোমলতা ও মধুরতা বৃদ্ধির সহায় হইতেছেন। ফলতঃ শত বৎসরে এ দেশের রমণীগণের অবস্থা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ভারতীয় আর্য্যসমাজের রমণীদিগের মত বা বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহিলাগণের মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলেও শতবর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসিনীদিগের যে অবস্থা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, এখন তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে! যে করুণাময় দেবতার প্রসাদে এবম্প্রকার শুভ ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে, সে দেবতার চরণে সহস্র নমস্কার! যে সকল ব্যক্তি এই শুভ কার্য্যের সহায় হইয়াছেন, তাঁহারাও ভারতবাসিনীদিগের শত শত বার নমস্য ও কৃতজ্ঞতাভাজন।

বিগত শতবর্ষে ভারতবর্ষের রমণীদিগের অবস্থা আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের এক বিশেষ কর্ত্তব্য বাকি রহিয়াছে। যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি রমণীজীবনের উদ্দেশ্য, ভারতীয় সমাজে সেই উন্নতিপথে কতকগুলি দোষ ও ত্রুটি কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সকল দোষাদি অনুসন্ধান করিয়া, যথাসাধ্য নিবারণ করা সকলেরই উচিত। সেই কথা মনে করিয়া আমরা ভারত-রমণীগণের উন্নতির অন্তরায়স্বরূপ দোষ ও ত্রুটি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এরূপ আলোচনায় কেহ দুঃখিত, নিরাশ বা বিরক্ত না হইয়া, দোষ ও ত্রুটি সর্ব্বথা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন, আমি বামাহিতৈষী মহোদয়গণের নিকটে ও আমার স্বদেশীয়া ভগিনীগণের নিকটে এই প্রার্থনা করি। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্মদীক্ষাকালীন উপদেশ।*

তোমরা ঈশ্বরের উপাসনার প্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছ। সেই জগতের স্রষ্টকর্ত্তা ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন। চক্ষু খুলিয়া দেখ তিনি এই বাহিরের জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন; চক্ষু মুদিয়া দেখ, তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজমান। তিনি বিশ্বসংসারের প্রাণ হইয়া বিশ্বসংসারকে নিয়মিত করিতেছেন, আত্মারও প্রাণ হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করিতেছেন। তাঁহার উপাসনা করিতে হইলে আত্মাতে তাঁহাকে

* দুইটী মহিলার দীক্ষাকালে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার মর্ম্ম।

দেখিতে হইবে। তাঁহার শরীর নাই, তিনি অশরীরী আত্মা, যেখানে দেখিবে সেইখানে তিনি। তিনি এখানে এখনি এই জ্যোতির মধ্যে এবং অন্তরে আমাদের সকলের কাছে বিদ্যমান। দূরে দেখিতে চাও, আকাশে দেখ, নিকটে দেখিতে চাও অন্তরে দেখ। অন্তরে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। আমি যেমন একা আছি, আমার অন্তরে আর একজন তিনি। তিনি অন্তর্যামী, তিনি হৃদয়ের ভাব জানেন। তাঁর নিকট রোগে, শোকে, বিপদে প্রার্থনা করিলে তিনি শ্রবণ করেন, এবং সকল অবস্থাতে রক্ষা করেন। তিনি আমাদের কাহারও প্রতি উদাসীন নন, আমরা তাঁর নিকট যা চাই, তা পাই। তিনি পিতার মত—মার মত। মার কাছে ছেলে গেলে মা ছেলেকে তাড়াইয়া দেন না, কোলে করিয়া লন। তাঁর নিকট গেলে তিনিও কোলে করিয়া লন। প্রতিদিন তাঁর কোলে বসিয়া প্রার্থনা করিবে। তাঁর নিকট সম্পদ চাও, ধর্ম্ম চাও, শান্তি চাও। বিপদের সময় বিপদ হইতে রক্ষার জন্য প্রার্থনা কর, তিনি রক্ষা করিবেন।

একটী মহামন্ত্র আছে :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

স্নান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। তাঁর নিকটে প্রার্থনা করিবে "দুর্ম্মতি দূর করি শুভমতি দাও হে, এই বরদান ভগবান্ মাগি।" আমার দুর্ম্মতি দূর কর, আমাকে শুভমতি দাও। প্রতিদিন এইরূপে প্রার্থনা করিলে আত্মার বল পাইবে। শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ের সহিত এই জপ ও প্রার্থনা করিবে।

পারিবারিক সঙ্গীত।

বল্‌বে—'অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম' আগে ভাই তাই বল না,
দিন্ থাকিতে বল্‌লে ও নাম এড়াবে যম-যাতনা।
এসেছিলে যে দিন ভবে, গোপনে একা নীরবে,
একা পুনঃ যেতে হবে, কেউত সঙ্গে যাবে না;
গৃহ ধন পরিজন, অসার মায়া-বন্ধন,
ফুরাবে দেহের সাথে কেন মিছে ভাবনা।
দুদিনের খেলাতে ভুলে, দিন আর কেটো না বিফলে,
চিরদিনের বন্ধু যিনি তাঁরে ভুল না;
তিনি পিতা তিনি মাতা, তিনি গুরু জ্ঞানদাতা,
তিনি ভবার্ণবে ত্রাতা, (সদা) তাঁরে জপ না।

হেঁয়ালী।

ধাতুময় দেহে মোর সদাই বিকার,
এক এক উপসর্গে এক এক প্রকার।
এক উপসর্গে চাপি ভোজনের থালা,
দ্বিতীয়েতে শোভা করি বরণের ডালা,
তৃতীয়ে বহাই পৃষ্ঠে রুধিরের ধার,
চতুর্থে লইয়া যাই শমনের দ্বার॥
সুবুদ্ধি যে নারী খুঁজি ধরিবে আমারে,
সুন্দর শোভায় আমি সাজাব তাহারে।

নূতন সংবাদ।

১। পঞ্জাবে বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ব্যয় অত্যন্ত অধিক, এবং দেশবাসীদিগের মহানিষ্টের কারণ দেখিয়া তত্রত্য সহৃদয় ছোট লাট সার জেমস্ ফিট্‌জ্‌পেট্রিক্ স্থানীয় কমিশনর ও ডেপুটী কমিশনরদিগকে দেশবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া অনিষ্টের প্রতিবিধানার্থ অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এই দৃষ্টান্তে আমাদের ছোট লাট সার চার্লস্ ইলিয়ট্‌ও বঙ্গবাসীদিগের হিতসাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এ দেশের সমাজহিতৈষী মহোদয়গণ এ সময় রাজপুরুষদিগের এই শুভ চেষ্টায় সহায়তা করুন্।

২। কুমারী ফ্লোরেন্স ডিসেন্ট, ব্রসেলস্ নগরে এম্ ডি উপাধি পাইয়াছেন। আলোয়ারের লেডী ডফরিণ চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

৩। জাপানীরা ফর্ম্মোসা দ্বীপের বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দলপতিকে বন্দী করিয়াছে। তথাকার নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে।

৪। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতে স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক বিষয়ে মত দিবার অধিকার পাইয়াছেন। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এ বিষয়ের আইন মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫। মেরী কাউডেন ক্লার্ক "Concordance to Shakespeare" পুস্তক প্রচার করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি এখন জেনোয়াতে বাস করেন, বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছে, তথাপি পাঠ ও কার্য্যে সমান অনুরাগ।

৬। টাইপ রাইটার নামক মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর যুক্তরাজ্যে ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ স্ত্রীলোক ইহা দ্বারা জীবিকা লাভ করিতেছেন। ইংলণ্ডে ৩ জন লোকের মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক আপনার পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৭। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতীর' সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়া দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবীর উপর উক্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন। উভয়েই সুশিক্ষিতা, মাতার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন।

৮। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে এক

শতের অধিক স্ত্রীলোক পাদরীর কার্য্য করিয়া থাকেন।

৯। বোম্বাইয়ের একজন শিল্পী একটি অতি ক্ষুদ্রকায় ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘড়িটীর আকার একটী সিকি অপেক্ষা বৃহৎ নহে। অন্যান্য ঘড়ীর ন্যায় ইহার ভিতরে যন্ত্রাদি সমস্ত আছে, এবং ইহা নির্ভুল সময় নির্দ্দেশ করিতেছে।

১০। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলদেশীয় এক মহিলা অন্ধদের জন্য একখানি অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন।

১১। মার্কিন নিউইয়র্ক সহরে খামের আটা চাটিয়া সম্প্রতি একটি লোক মারা গিয়াছে। চিঠির খামের আটা কখন কখন বিষের গুণ ধারণ করে।

১২। আমেরিকায় এখন চল্লিশ সহস্রাধিক স্ত্রীলোক কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তত্রত্য ওবার্লিন কলেজ প্রথম স্ত্রীলোক ভরতি করেন।

১৩। আকাশমণ্ডলের এক নূতন ফটোগ্রাফ লণ্ডনে প্রস্তুত হইতেছে,তাহাতে নক্ষত্রসংখ্যা ৬ লক্ষ ৮০ হাজার।

বামারচনা।

শিশুর জন্ম উপলক্ষে।

(১১ই বৈশাখ—মঙ্গলবার ৪ ঘটিকা।)

স্নেহের মুকুল।

আজ বৈকালিক বায়
স্বর্গের সুরভি ভরা,
আজিগো অমৃতময়ী
আমার সমস্ত ধরা। ১।
আজি কি বৈশাখ মাসে
শুভ বসন্তের মেলা,
ফুলের দোকান খুলি
হাসে সব দিক্‌বালা। ২।
নিকুঞ্জে ভ্রমর সখা
ঘুমায় অবশ প্রাণে,
বৌ কথা কও কথা
এখন আসিছে কাণে। ৩।
জানি না আজিগো হেথা
দয়েল কি স্বরে গায়,
মলয় স্বর্গের কেনা
আতর ছড়ায়ে যায়। ৪।
আজি কি স্বর্গীয়ভাবে
ভরিয়া সামান্য হৃদি,
বৈকালিক বেল ফুলে
কপোত ঢালিছে গীতি। ৫।
বৈশাখের তীব্র তাপে
আজি জলিছে না কায়,
রবি ছবি আবরিয়া
নব মেঘ ভেসে যায়। ৬।
নীল নীলিমের কোলে
অতি নব নব ঘন—
দিগন্ত কম্পিত করি
করিতেছে গরজন। ৭।

আনন্দে বহিছে বেগে
ধমনীতে রক্তধারা,
আজি যে জগত দেখি
সুন্দর অমিয়া-ভরা। ৮।
আজি যে প্রাণের মাঝে
আনন্দের ঢেউ বয়,
নিরাশায় ভগ্ন হৃদি
আজি কিগো শোভাময়! ৯।
আজি যে হৃদয় ভেদি
জাগিছে করুণা গান,
সঞ্জীবনী সুধা আসি
বাঁচাইল মৃত প্রাণ। ১০।
বাছা,—
স্বরগের দ্বার খুলে
কে তুই নামিয়া আলি
ধরার অন্তর রাজ্যে
অজস্র আনন্দ ঢালি। ১১।
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা
হ'লো আজি এ হৃদয়,
বিভুর করুণা স্মরি
আনন্দ উচ্ছ্বাসে বয়। ১২।
কে তুই দেবের শিশু,
স্বর্গের পুতুল!
কুটিলি হৃদয়ে মম
স্নেহের মুকুল!। ১৩।
ঊষার বরাঙ্গ-ভূষা
নন্দন ত্রিদিব-ছায়,
অলকা অমরাবতী
আলো করি সমুদায় ১৪।
আছিলে অথবা কিগো
বাসবের বামস্থলে,
যেখানে সহস্র শশী
সহস্র তারকা জ্বলে। ১৫।
যেখানে সোনালী শাখে
বসন্ত সুছন্দে লয়ে
আছিলে, বসন্ত-বায়ে
বুঝি পথভ্রষ্ট হয়ে—১৬।
এসেছ ধরায় প্রিয়
ত্রিদশের ফুল,
এস ওরে প্রাণাধিক
স্নেহের মুকুল॥ ১৭।
বিজলী অপাঙ্গ-চ্যুত
প্রাণে এস জ্যোতি-কণা,
চাবে না এ প্রাণ আর
হীরা মণি সোণা দানা। ১৮।
সংসার দগধ বড়
তপ্ত মরুভূমি পারা,
কে তুমি এ তপ্ত ধূলে
ঢালিলে অমিয়াধারা। ১৯।
নিরাশার গাঢ় মেঘ
ঘন আঁধারের ছায়,
কে তুমি বাসবধনু
শীতল করিলে কায়। ২০।
শীতের কুহেলি মাখা
মৃত অবসন্ন হিয়া
আসিলে বসন্ত হেথা
কবে কোন্ পথ দিয়া। ২১।
জাগাইতে অভাগীর
মৃতবৎ আশাগুলি,
ত্রিদশের নাথ প্রভু
দিয়াছেন হাত তুলি। ২২

দেবরক্ত গান্ধ ভরা
স্বর্গের পুতুল,
লও মম স্নেহাশীষ
স্নেহের মুকুল। ২৩।

চাঁদের প্রতিভা মাখা
বুঝি স্বর্গচ্যুত তারা,
আসিলে দুঃখীর ঘরে
বুঝি পথ হয়ে হারা। ২৪।

তোর এ অধরস্পর্শে
জুড়াইল দগ্ধ প্রাণ,
তুমিরে বিরাজে হাসি,
আঁধারে আলোক-দান। ২৫।

কোন্ দেব আনি দিল
তোমা হেন ধন আহা,
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে
ভাবিয়া না পাই তাহা। ২৬।

কি দিয়ে—দুঃখিনী আমি
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে,
তাঁর উপযুক্ত ধন
কি আছে আমার ঘরে। ২৭।

অনন্ত অব্যয় তিনি
তুষ্ট কি হবেন ধনে?
প্রাণের ভকতি রাশি
ঢেলে দিব সে চরণে। ২৮।

জন্ম মাত্র এই কুলে
পূজেছি তাঁহার পায়,
দেবের প্রসাদি ফুল
বিপদ ছোঁবে কি তায়? ২৯।

চিরজীবী হয়ে বাছা
থাক মোর কোল যুড়ে,
মায়েরে একেলা রাখি
কখন যেও না দূরে। ৩০।

স্নেহের মুকুল মম
ক্রমে বিকশিত হও,
যাঁর করুণায় দান,
তাঁর ভাবে মজে রও। ৩১।

বিশ্ব-মার হিতব্রতে
সঁপিয়া দিওরে প্রাণ,
দুঃখী ভাই ভগ্নীগণে
সান্ত্বনা করিও দান। ৩২।

স্বরগ কোথায় বাছা,
স্বরগ কোথায় রয়,
তোমারি হৃদয় যেন
সহস্র স্বরগ হয়। ৩৩

সত্য, ধর্ম্ম, ক্ষমা, নিষ্ঠা
এ'দেরি দেবতা কয়,
তোমার হৃদয়ে যেন
দেবতা-আসন হয়। ৩৪।

তুমি—
পারিজাত-মধু-ভরা
স্বর্গের পুতুল,
হৃদয়ের ধন মম
স্নেহের মুকুল।!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

*** বিশেষ দ্রষ্টব্য—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ ৭০ পৃষ্ঠা ২৭।২৮ পংক্তি 'যথাপরিমাণ' স্থলে অর্দ্ধ আনা পরিমাণ হইবে। এবার স্থানাভাবে সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।—বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৭ সংখ্যা।	শ্রাবণ ১৩০২—আগষ্ট ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মন্ত্রিসভা-পরিবর্ত্তন—প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করাতে লর্ড সালিসবরী প্রধান রাজমন্ত্রি-পদে বৃত হইয়াছেন। উদারনৈতিক দলের পরিবর্ত্তে রক্ষণশীল দল কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। লর্ড সালিসবরী তৃতীয় বার এই মহোচ্চ পদ লাভ করিলেন। নবগঠিত মন্ত্রিসভায় লর্ড ল্যান্সডাউন সমরবিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারী ও লর্ড জর্জ হামিল্টন ভারতের ষ্টেট্‌ সেক্রেটারী হইয়াছেন।

মাইকেল-স্মৃতি—কবিবর মাইকেল মধুসূদনের ২২ সাংবৎসরিক বন্ধুসমাগম গত ২৯এ জুন তাঁহার সমাধিস্থলে সম্পন্ন হইয়াছে। আকাশের দুর্য্যোগ সত্ত্বেও কবির অনেকগুলি বন্ধু ও অনুরাগী একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রদর্শন করেন। এতদুপলক্ষে পঠিত কবিতা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এই কার্য্যের নেতৃত্ব ভার সম্পন্ন করিয়াছেন।

চীন-রুসীয় সন্ধি—গোপনে সেণ্ট পিটার্সবর্গে এই সন্ধির লেখাপড়া হইয়াছে, ইহাতে রুসের ক্ষমতাবিস্তারের অনেক সুবিধা হইবে। জাপান ও চীনের গাঢ়তর মিলন প্রার্থনীয়।

দানশীলতা—(১) টাকীর জমীদার রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী ৩০০০৲ টাকা ব্যয়ে স্থানীয় ছাত্রনিবাস প্রস্তুত করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

(২) রাজসাহী জেলার কাসিমপুরের জমীদার কুমার কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী "বিদ্যাসাগর বৃত্তি" নামে ৫৲ টাকার

৭৫টী ছাত্রবৃত্তি দিবার মানস করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫০টী বঙ্গদেশে, ২৫টী করিয়া ৭৫টী উত্তর-পশ্চিম, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে, এবং ১২টী আসাম ও ব্রহ্মে প্রদত্ত হইবে। অতি সাধু অনুষ্ঠান।

বল্টিক খাল—বিস্তর ব্যয়ে জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের ভিতরে এই খাল খনিত হইয়াছে, ইহার ভিতর দিয়া বড় বড় জাহাজ চলিবে। জর্ম্মণ-সম্রাট্ উইলিয়ম সমারোহে ইহা খুলিয়াছেন। ফরাসী, রুশ ও ব্রিটিষ পোত সকল এই উপলক্ষে একত্র হইয়াছিল।

রাজ্ঞী-চরিত—ভারতেশ্বরী বিবী ফসেট-রচিত স্বকীয় জীবন-চরিতের এক-খণ্ড আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

স্ত্রী-বিদ্যালয়—স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত বিক্টোরিয়া কলেজ বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার কয়েকটী ভক্তিমান্ শিষ্য ও সহচর ঐ নামে একটী নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম। ইঁহারা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অতি ব্যয়সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর ইহাদের সহায় হউন।

অনাথাশ্রম—শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দত্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কয়েক বৎসর বহু পরি-শ্রম, ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া অনেক-গুলি নিরাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকাকে লালনপালন ও শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান বর্ষে এই আশ্রমের আয়ের কতক উন্নতি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। সহৃদয় নরনারীগণ এই সাধু কার্য্যে অর্থদান দিয়া ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির উপায় করুন্।

ডাকে সুবিধা—পুলিন্দা ডাকে ২০ তোলায় ।০ আনা মাসুল লাগিত, তাহার স্থানে ৵০ আনা হইয়াছে। ৪০ তোলায় চারি আনা, তাহার পর প্রত্যেক ৪০ তোলার ঐ হার।

নূতন রেলপথ—বঙ্গ-নাগপুর রেল-ওয়ের কর্ত্তারা মেদিনীপুর হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত এক শাখা রেলপথ প্রস্তুত করি-বেন। ষ্টেট সেক্রেটারী এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

বেঙ্কটে হরিবোলা।

(১)

ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ত্রিবা-ঙ্কোড়ের নিকট বেঙ্কট নামে একটি নগর আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন সময়ে একটী চতুর্ব্বিংশবর্ষীয় নবীন সন্ন্যাসী দিবা দ্বিপ্রহরে তথায় উপস্থিত হন। সন্ন্যাসীর মস্তকে জটাভার, বর্ণ পুরট সুন্দর, কটিতে কৌপীন বহির্ব্বাস, মূর্ত্তি মনোহর, বদনে নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ' নাম।

শ্রী অঙ্গ পুলকিত, লোচন অশ্রু-প্লাবিত, মন্দপবনান্দোলিতা কনকলতিকার ন্যায় দেহযষ্টি সুকম্পিতা, উদ্গত স্বেদবিন্দু-নিচয়ে সর্ব্বাঙ্গ শিশিরসিক্ত চম্পকবৎ, কণ্ঠস্বর গদ্গদ, ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল কনককান্তি মলিন হইতেছে, কখন তিনি নামানন্দে উন্মত্ত হইয়া বিহ্বলভাবে ভূমি-বিলুণ্ঠিত হইতেছেন, কখন এমন স্তম্ভিত ভাব যে, একেকালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেছেন, কখন বা মৃত দেহের ন্যায় নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত হইতেছে, কখন কাঁটা খোঁচা না মানিয়া উলঙ্গভাবে ধরাতলে আছাড়িয়া পড়িতেছেন, শত শত ডাকেও বাক্য-স্ফূর্ত্তি নাই! এইরূপ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্যভাবে তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। ঐ সময়ে বেঙ্কট নগরে বেদান্ত-দর্শনে পারদর্শী একটী অদ্বিতীয় অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ছিলেন। সাধু, মোহান্ত, পণ্ডিত, অধ্যাপক কেহ কোন স্থান হইতে বেঙ্কটে উপস্থিত হইলেই তিনি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতেন এবং প্রায়ই সকলকে পরাজিত করিতেন। তাঁহার নাম রামানন্দ দণ্ডী স্বামী। এইরূপে অনেক ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করাতে ক্রমশঃ দণ্ডী স্বামীর প্রবল অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। নবাগত নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই তিনি তাঁহার নিকট গমন করিলেন, বিচার করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। নবীন সন্ন্যাসী তাহা শ্রবণমাত্র কহিলেন, "আমি আপনার নিকট বিচারের পূর্ব্বেই পরাজিত হইলাম।" তচ্ছ্রবণে দণ্ডী স্বামী অধিকতর বিচারাগ্রহ জানাইলেন। তখন সন্ন্যাসী হাস্য করিলেন। সে হাস্যে যেন এই ভাব প্রকাশ পাইল, দর্পহারী ভগবান্ সকলেরই দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। অনন্তর দণ্ডী স্বামী অদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থক বিচারের অবতারণা করিলেন। বালক সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে সুধা-মধুর ভাষায় ধীর ও গম্ভীর ভাবে অদ্বৈতবাদের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীকে দ্বৈতবাদ বুঝাইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ ঘোরতর বিচারের পর রামানন্দ দণ্ডী স্বামী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট হরিনামে দীক্ষিত হইলেন। নবীন গুরু, নবীন শিষ্যের কর্ণে হরিনাম-সুধা ঢালিয়া দিলেন। স্বামীজীর হৃদয়ে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু উছলিয়া পড়িল। তখন তিনি নব প্রভুর চরণে প্রণতিপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা লইয়া স্বীয় মঠে গমন করিলেন এবং আপনার যাবতীয় শিষ্যকে হরিনাম-বীজ প্রদান করিলেন। শিষ্যগণ আপনাদিগের চিরকালকার অদ্বৈতবাদী কঠোর সাধক ঘোর তার্কিক গুরুর শুষ্ক হৃদয় ভগবৎপ্রেমে উচ্ছ্বসিত দেখিয়া একেকালে বিস্মিত ও মোহিত হইলেন।

(২)

বেঙ্কট নগরের উপকণ্ঠে অনতিদূরবর্ত্তী বগুলা নামক একটী ভয়ঙ্কর অরণ্য ছিল। মনুষ্যাদির অনধিগম্য বন জঙ্গল স্বভাবতঃই বন্য ও হিংস্র জন্তুগণে ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। অধিকন্তু সেই বনে পান্থভীল নামক একটী ভয়ানক দস্যু সদলবলে

অবস্থান করাতে বনবিভাগ ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইয়াছিল। বনের মধ্যে মধ্যে বন্ত তরুলতায় সমাচ্ছন্ন ও সূর্য্যালোক-পরিশূন্ত সঙ্কীর্ণ সড়ক সকল থাকিলেও আরণ্য জন্তু ও দস্যুর ভয়ে প্রায় কেহই সে পথে যাতায়াত করিত না। নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অবশ্যই পথিক-গণকে বনমধ্যে প্রবেশ করিতে, এবং হয় হিংস্র জন্তুগণ-মুখে, নয় পাষণ্ডীলের হাতে প্রাণ হারাইতে হইত। এজন্য কেহ ইচ্ছা করিয়া বা নিষ্প্রয়োজনে দিবা দ্বিপ্রহরেও সে দিকে গমন করিত না।

আমরা পূর্ব্বে যে কনক-কান্তি-কলেবর কমনীয় নবীন সন্ন্যাসীর উল্লেখ করিয়াছি, তিনি তিন দিন বেঙ্কটে অব-স্থানপূর্ব্বক অকপটে ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। তত্রত্য নরনারী, বালকবালিকা, যুবাবৃদ্ধ সকলেই নামানন্দে মাতিয়া উঠিল। তদ্ব্যতীত নগরের উপ-কণ্ঠ হইতে প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসিয়া হরিনাম লইতে লাগিল। সন্ন্যাসী নিজে উন্মত্ত ভাবে উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকেও নাচাইয়াছিলেন। শুদ্ধ নাম নহে, সকলকে ভক্তিতত্ত্বেরও উপদেশ দিতে লাগিলেন। চিরকালকার বিখ্যাত মূঢ়গণও বালক সন্ন্যাসীর চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কৃতপাপ, দুরাচার, পতিত, পাষণ্ড, নিন্দুক আদি নীচ জন-গণকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসী তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে এবং দীন ভাবে নাম দিতে লাগিলেন। বালক সন্ন্যাসীর পবিত্র শ্রীবদন-বিনির্গত হরিনাম তাহাদিগের হৃদয়ে তাড়িতপ্রবাহের কার্য্য করিতে লাগিল। তাহারাও উন্মত্তবৎ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

একদা অপরাহ্ণে দেখা গেল, ঐ সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্ত ভীষণ অরণ্যাভিমুখে গমন করিতেছেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে ঐ বনমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছে। তাহারা সান্ত্বনয়ে কহিতেছে, "আপনি ঐ বনে যাইবেন না, দুরাচার পাষণ্ডীল জ্ঞানহীন, সে আপনাকে পাইলে বধ করিবে।" সন্ন্যাসী কাহারও কথা না শুনিয়া বগুলার ভীষণ বনে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে একটী মাত্র শিষ্য রহিল।

(৩)

যে দিন বালক সন্ন্যাসী কাহারও নিষেধ না মানিয়া বগুলার ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার চারি পাঁচ দিন পরে একদা মধ্যাহ্নকালে একজন ডোরকৌপীন-ধারী সন্ন্যাসী উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে বেঙ্কট সহরে প্রবেশ করিলেন। তিনি কিয়ৎকাল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় সেই বনে প্রবেশ করিলেন। নগরের অনেক লোক তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে বনের নাম শুনিলে নগরবাসিগণ শঙ্কায় আকুল হইতেন, এখন দেখিলেন যে, সেই বন আনন্দ-কানন হইয়াছে। দস্যুদলপতি

পান্থভীল সেই আনন্দমঠের অধীশ্বর এবং সহচর দস্যুগণ সেই মঠেশ্বরের শিষ্য হইয়াছেন। দস্যুবৃত্তিপরায়ণ পান্থভীলকে ও তাহার অনুচরগণকে পূর্ব্বে অনেকেই বিবিধ কুকর্ম্ম করিতে দেখিয়া বা শুনিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন, সেই পান্থভীল ডোরকৌপীনধারী সর্ব্বত্যাগী সদাচার-পূত সন্ন্যাসী; হরি বলিতে নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে এবং কদম্বকুসুমবৎ সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইতেছে। অনুচরগণেরও সেই দশা। তাঁহারাও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন,—"মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কি জায়! মহারাজ পান্থ ভীল কি জায়!" অনুবর্ত্তী নগরবাসিগণ বিস্মিত হইলেন।

বালক সন্ন্যাসী বগুলার বনে প্রবেশ করিয়াই পান্থভীলের সাক্ষাৎ পাইলেন। প্রেমোন্মত্ত হরিবোলা সন্ন্যাসি-দর্শনে পান্থের মনে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা জানা যায় না; কিন্তু সে পরম যত্নে সন্ন্যাসীর আতিথ্য করিল। সন্ন্যাসী তাহার আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—

"—পান্থ তুমি সাধু মহাশয়।
তোমারে দেখিয়ে সব পাপ হইল ক্ষয়॥
গৃহস্থের ন্যায় তুমি নহ গৃহবাসী।
তুমিত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের ন্যায়।
যাতে তাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয়॥
পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়া।
বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া॥
ধন্য পান্থরাজ তুমি সাধুশিরোমণি।
তোমারে দেখিয়া সুখী হইল পরাণী॥
তৃণ তুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব।
এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব॥
রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস।
তাই আইলাম হেথা মিটাইতে আশ॥
শিষ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত।
তোমাকে দেখিলে হয় চিত্ত পুলকিত॥
মায়া মোহে বদ্ধ তুমি নহ মহাশয়।
তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মনে লয়॥"

ভীল নীরবে সন্ন্যাসিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। যে রূপ দেখিলে মনুষ্য দূরে থাকুক, বনের পশু পক্ষীও মুগ্ধ হয়, সেই রূপ হইতে সুধাস্বরূপ হরিনাম শুনিয়া পান্থের হৃদয়ে ভক্তিপারাবার উথলিয়া উঠিল। তিনি সন্ন্যাসীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর পান্থকে ক্রোড়ে লইয়া হরিনাম দিলেন। সেই দিন হইতে দস্যুদলপতি পান্থভীল সর্ব্বপ্রকার পাপাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ডোর কৌপীন ধারণ করিলেন এবং ক্রমশঃ ভক্তিতত্ত্বে প্রবীণ হইয়া সাধুর অগ্রগণ্য হইলেন। অন্যান্য সহচর দস্যুগণও আপনাদিগের নেতা পান্থভীলের পন্থা আশ্রয় করিল। তাহারা হরিনামে উন্মত্ত হইয়া সাধুর অনুমোদিত সদাচার ও আতিথ্যাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা সেই বধ্য ভূমিকে আনন্দ-কানন করিয়া তুলিল।

যখন পান্থভীল, হরিবোলা অতিথির চরণে বিলুণ্ঠিত হইতেছিলেন, তখন পান্থের দুই একটী অনুচর সন্ন্যাসী

শিষ্যের নিকট বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলেই এ প্রবন্ধের উপসংহার হয়।

একজন অনুচর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনার এবং আপনার গুরুদেবের নাম কি ?"

সন্ন্যাসীর সঙ্গী কহিলেন,—

"আমার গুরুদেবের নাম মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং আমার নাম গোবিন্দদাস।"

অনুচর কহিলেন,—

"আপনাদের নিবাস কোথায় ?"

গোবিন্দ কহিলেন,—

"আমার প্রভুর পূর্ব্ব নিবাস শ্রীধাম নবদ্বীপে ছিল, এখন সর্ব্বত্র। আমারও তথৈবচ।"

অনুচর,—"এখন সর্ব্বত্র, এ কথার অর্থ কি ?"

"এখন আমার ঠাকুর সোণার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। এক দিন,—দুই দিন,—বড় জোর তিন দিনের অধিক কোথাও থাকেন না। আমিও কনককামিনী ত্যাগ করিয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে গোবিন্দের চক্ষে জল আসিল। তদ্দর্শনে অনুচরগণ কহিল,

"আপনি কাঁদেন কেন? ঠাকুর সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া ? না আপনার কনককামিনীর শোকে ?" গোবিন্দ এ কথার কোন উত্তর করিলেন না; অবনতবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পান্থভীলের অনুচরগণ-সমীপে পূর্ব্ব বিবরণ বিবৃত করিবার সময় শশিমুখীর অশ্রুপ্লাবিত শশিবদন গোবিন্দের মনে পড়াও বিচিত্র নহে। কেন না গোবিন্দ সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ হইয়া গৃহত্যাগ করিলে, তাঁহাকে পুনরায় গৃহে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার রমণী শশিমুখী অনেক কাঁদিয়াছিলেন, আমরা 'গোবিন্দের গৃহত্যাগ' নামক প্রবন্ধে, তাহা বর্ণন করিব।

এই গোবিন্দ দাস, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আশ্রয় লয়েন; এবং চৈতন্যদেবের অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত বরাবর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি যেখানে যেরূপে হরিনাম প্রচার করিতেন, গোবিন্দ তাহা নিত্য নিত্য লিখিয়া রাখিতেন। ঐরূপ লিপিকে ডায়েরি, দিন-লিপি, বা করচা কহে। গোবিন্দের ঐ লিপি, করচা বলিয়াই বিখ্যাত হইয়াছে। সম্প্রতি উহা "গোবিন্দদাসের করচা" এই নামীয় একখানি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শান্তিপুর মিউনিসিপাল্ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল গোস্বামী মহাশয় উহার প্রকাশক। চৈতন্যদেবের হরিনামপ্রচার বিষয়ে কয়েকটী ঘটনা আমরা আখ্যায়িকার আকারে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিব। যে সকল গ্রন্থ হইতে ঐ সকল আখ্যায়িকার ঘটনা সঙ্কলিত হইবে, তাহার অন্যতমরূপে এই করচাখানিও গৃহীত হইল।

বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬৬ সংখ্যা, ৯১ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুভূত হয়, এদেশীয় মহিলাদিগের উন্নতির প্রথম অন্তরায় পুরুষদিগের মত-বিসংবাদিতা। যাঁহারা ভারতের অভ্যন্তরীণ সংবাদ জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, স্ত্রী-জাতির হিতৈষিগণের মধ্যে (কতকগুলি বিজ্ঞ দূরদর্শী মহাত্মা ব্যতীত) এদেশে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল, দুই সম্প্রদায় আছেন। * স্ত্রীজাতির শিক্ষা, কার্য্য, আচার, ব্যবহার, কিছুই পুরাতন জিনিষ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে না, বিলাত হইতে সংগৃহীত বা নূতন আবিষ্কৃত উপকরণে নারীজীবন গঠন করিতে হইবে, ইহাই উদার-নৈতিক দলের মত। আর দেশের যে সকল পুরাতন জিনিষ আছে, নারী-জীবনে চিরদিন তাহাই থাকিবে, কোনও বিষয়ে এক চুল তফাৎ হইবে না,—শতাব্দী পূর্ব্বে রমণীগণ যে অবস্থায় ছিলেন, শতাব্দী পরেও তাঁহাদিগের সেই অবস্থায় থাকা উচিত ;—ইহাই রক্ষণশীল দলের মত। এইরূপ তর্কের ফলে, অনেক সত্য উজ্জ্বলতর ভাব ধারণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাতে সাধারণ মানবের এই এক বিশেষ অবনতি হয় যে,সত্যানুসন্ধান, সত্যরক্ষা, জীবনের ব্রত না হইয়া আত্ম-পক্ষ সমর্থন করাই জীবনের ব্রত হইয়া উঠে। এ দেশেও তাহাই হইয়াছে। স্ত্রী-হিতৈষণা করিতে গিয়া এই দুই সম্প্রদায় প্রতিপক্ষকে কুযুক্তি, বিদ্রূপ,গালি প্রয়োগেও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ মত-বিসংবাদিতা স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে এই বিষম বাধা জন্মাইতে ছে যে, যেখানে উদারনৈতিক দলের কর্তৃত্ব, সেখানে রমণীগণ অনেকেই জাতীয় ভাব হারাইয়া বসিতেছেন। আবার, যেখানে রক্ষণশীল দলের কর্তৃত্ব, সেখানে রমণীর উন্নতিলাভ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাই বলিতেছি, যতদিন এই দুই সম্প্রদায় অভিমান, মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া সত্য-রক্ষায় ও নারীহিতৈষণায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী না হইবেন, ততদিন এদেশীয় নারীগণের পূর্ণোন্নতির আশা দুরাশামাত্র।

উদারনৈতিক সম্প্রদায় জানিতেছেন, যাহা মানবের স্বাভাবিক শক্তি, অনুশীলন দ্বারা তাহার বিকাস-সাধনকেই উন্নতি বলা যায়। দেশ, কাল ও পাত্রবিভেদে মানবের

* "বাঙ্গালী রমণীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই দুই সম্প্রদায়ের বিষয় বর্ত্তমান লেখিকা কর্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ ১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে উক্ত সালের পৌষ মাস পর্য্যন্ত বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

স্বাভাবিক শক্তির পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। একজন গোরা সিপাহী বালকের রুচি স্বভাবতঃ যে পথে যাইবে, একজন নিরীহ বাঙ্গালি বালকের রুচি স্বভাবতঃ সে পথে যাইবে না। যাহা হউক, স্ত্রীজাতির উন্নতির অর্থ তাঁহাদের স্বভাবের বিকার নহে, স্বভাবের বিকাস। এদেশে নারী-চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিলে, আর যে সকল সদ্‌গুণের অভাব ছিল, (নারীজাতির উপযোগী) সেই সকল সদ্‌গুণ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে, নারীজীবন প্রকৃত উন্নত হইতে পারে। নচেৎ এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গাউন পরিলে, "বুট" পায়ে দিলে, অথবা অজানিত-চরিত্র পুরুষদিগের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিলে নারীজীবনের বাস্তবিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সকল রকম উন্নতির বিষয়েই এ কথা প্রযোজ্য।

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও জানিতেছেন যে, উন্নতিই বিশ্বজগতের জীবন। এ জগতের যাহার উন্নতি নাই সে মৃত—সে জীবন্ত জড়। কিন্তু উন্নতির পথ শুধু স্থিতিশীল নহে; তাহার পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। ভাল জিনিস যাহা, তাহা থাকিবে; মন্দ জিনিস যাহা, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে; তাহার বদলে বিদেশে যদি ভাল জিনিস মিলে, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। এখনকার কোনও রমণী যদি চিঠি পড়াইবার জন্ম লোক খুঁজিয়া বেড়ান, সেটা কি বড় সুখের বিষয় হয়?—তাই বলিতেছি, উভয় পক্ষ সবিশেষ চিন্তা করিয়া মতের সামঞ্জস্য করিলে এ অন্তরায় দুই দিনেই দূর হইতে পারে। মতামতের বাদানুবাদ দুই চারি দিনের জন্য, কিন্তু সত্যের জন্য যে কাজ তাহা অনন্ত কালের জন্য।

রমণীদিগের উন্নতির দ্বিতীয় অন্তরায়, পল্লিগ্রাম-বাসিনীদিগের সুশিক্ষাহীনতা। বোধ হয় আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে (বঙ্গদেশে) পল্লিগ্রামে দেশের প্রায় বার আনা লোক বাস করে। সুতরাং সহর অপেক্ষা পল্লিগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যাও অনেক বেশি। এই সকল রমণীর সুশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ যে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এ কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। এই সকল বিদ্যালয়ে পল্লিগ্রামের (উচ্চ-শ্রেণীস্থা) বালিকাগণ, ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক বালিকা নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা কচিৎ দুই একজন বালিকা দিতে পারেন মাত্র। অধিকাংশ বালিকাই বোধোদয়, ধারাপাত ও শিশুবোধ ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের সহিত অনেকে লেখা পড়ার চর্চ্চাও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে যে সম্পূর্ণরূপে অক্ষর-জ্ঞান লুপ্ত হয় না, সে প্রধানতঃ সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু ও অন্যান্য কয় জন সুলেখকের লিখিত উপন্যাস এবং প্রবাসস্থ আত্মীয়দিগকে পত্র

লেখারই জন্য। একে পল্লিগ্রামের বিদ্যালয়ে ইংরাজি বা সংস্কৃত কোনও ভাবা শিক্ষা বা শিল্প ও গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহাতে বঙ্গভাষায়ও এতটুকু লেখা পড়া শিখিয়া, লেখা পড়া শিখিবার কোনও ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীনা মহিলাগণের অনেকের যে সকল অসদ্‌গুণ ছিল, সেই কলহপ্রিয়তা, পরনিন্দাপ্রিয়তা, সেই অসংযতচিত্ততা, সেই কুসংস্কার প্রভৃতি ধারাবাহিকরূপে নবীনাগণের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। আজিও বানর-জাগা, জামাই-তামাসা প্রভৃতি উপলক্ষে কত পল্লিগ্রামের নারী কুরুচির পরিচয় দিয়া থাকেন; রোজা প্রভৃতি কত পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের নিকটে প্রভুত্ব খাটাইয়া থাকে; পরিচ্ছদাদির উন্নতিও অনেক পল্লিগ্রামে কিছুই দেখা যায় না; এতদ্ভিন্ন পল্লিগ্রামে শিক্ষয়িত্রী, সুশিক্ষিত ধাত্রী বা মেয়ে ডাক্তার, কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাতে পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের যে কতদূর অসুবিধা হয়, তাহা চিন্তাশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পল্লিগ্রামে বাঙ্গালার প্রায় বার আনা লোক বাস করেন। এই বার আনা লোকের মাতা, স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতি যদি এতদূর হীনাবস্থায় থাকে, তবে ভারতরমণীদিগের জাতীয় উন্নতি এখনও যে কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সেই সর্ব্বদর্শী ভগবানই জানেন। যত দিন পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের উন্নতি না হইবে, ততদিন এ দেশীয় রমণীগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা, কথার কথা মাত্র।

এই দুরবস্থা দূর করিতে হইলে আগে পল্লিগ্রামের বিদ্যালয়গুলির সংস্কার করা আবশ্যক। পল্লিগ্রামের বালিকাগণ, বিদ্যালয়ে যাহাতে সুনীতি, সভ্যতা, গৃহকর্ম্ম, শিল্প, সঙ্গীত, জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য এক জন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইলে বালিকাগণ অনেকেই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন।* গবর্ণমেণ্ট যদি অনুগ্রহ করিয়া পল্লিগ্রামের মহকুমায় বা থানায় এক একজন স্ত্রী-ডাক্তার ও সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে অভাগিনী পল্লিগ্রামবাসিনীগণ মহোপকৃতা হইতে পারেন।

শুনিতে পাই, এ দেশের অনেক কৃতবিদ্য মহিলা কাজ খুঁজিয়া পান না। অভাগিনী পল্লিগ্রামবাসিনীদিগের প্রতি যদি ইহাঁরা একটু অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় অবকাশই পান না। কুমারী কুক, কুমারী কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিদেশবাসিনী হইয়াও দুঃখিনী ভারতমহিলাদিগের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; ভগবতী দেবী, রাণী রাসমণি প্রভৃতি উচ্চতর শিক্ষা না পাইলেও স্বজাতীয়দিগের মঙ্গলের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, একালে উচ্চশিক্ষিতা

* এইরূপ শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অন্তঃপুর-স্ত্রী শিক্ষাও সাধিত হইতে পারে।

বঙ্গবাসিনীদিগের জাতীয় গৌরবস্বরূপা, কৃতবিদ্য-বঙ্গমহিলারা কি তাঁহাদের অভাগিনী ভগিনীগণের দুঃখ ঘুচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন না?

আবার, পল্লিগ্রামের উচ্চবংশীয়া রমণীদিগের অবস্থা অনেক অংশে হীন। বিগত শতাব্দীর প্রবর্ত্তনসময়ে বঙ্গবাসিনীদিগের যে রকম অবস্থা ছিল, আজি শতাব্দীশেষে নিম্ন শ্রেণীর রমণীগণের অবস্থার সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার প্রভৃতি এবং শিশু-বিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ প্রভৃতি ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষদিগকে দলিত করিতেছে। ইহাদিগের প্রকৃত উন্নতি কতকালে হইবে, ভগবানই জানেন।

রমণীগণের উন্নতির তৃতীয় অন্তরায় ভক্তি-ভাব-হ্রাস। যাঁহারা সে কাল ও এ কালের নারী-চরিত্র বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই এ শোচনীয় ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। দেশের পুরুষগণের ভক্তিভাবের হ্রাস হওয়াতে যে বিষম ক্ষতি হইতেছে, ভক্তিভাজন বঙ্কিম বাবু সে কথা তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব-গ্রন্থে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পুরুষজাতির অপেক্ষা স্ত্রীজাতির ভক্তিভাব-হ্রাস আমরা অধিকতর অনর্থকর বিবেচনা করি। বলিতে কি, আজি কালি স্ত্রীপ্রকৃতি যে অনেকটা রুক্ষ হইয়া পড়িতেছে, স্ত্রীচরিত্রের স্বাভাবিক কোমলতা কমিয়া যাইতেছে, সে এই ভক্তি-ভাব-হ্রাসের জন্য।

শতাব্দী পূর্ব্বে এ দেশের নারীগণের ভক্তিভাব কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা আমাদের পাঠকপাঠিকাগণ অবগত আছেন। ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া, ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহারা কত দুরূহ কাজও সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত এখনও যে কোন মহিলা কুসংস্কার-পরায়ণা হইয়া সাপ, বিড়াল পর্য্যন্ত জীব জন্তুকে শতকোটী প্রণাম করিবেন, ইহা কখনই প্রার্থনীয় নহে। তবে যে ভগবদ্ভক্তির প্রবলতায় রমণী কোলের সন্তান সমুদ্রে টানিয়া ফেলিতেন, যে ভগবদ্ভক্তির প্রবলতায় কুলবালা অবরোধবাসিনী বঙ্গমহিলা, শত ক্রোশ দূরে, দেবমন্দিরে পদব্রজে যাইতে পারিতেন, আজি সে ভগবদ্ভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে! ভগবানের চরণে এখন সে আত্মসমর্পণ, সে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ, কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? আজি সে ধর্ম্মপ্রাণতা কোথায় গেল? নারীজাতির এমন ভক্তির হ্রাস যে কতদূর অবনতিকর, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মাচার্য্যগণ সত্যধর্ম্মের প্রচারে যতই যত্নবান্ হউন, তাহা গ্রহণ করিবার মত হৃদয় না থাকিলে, কখনও কৃতকার্য্য হইবার আশা থাকিবে না। পূর্ব্বে ভারতমহিলাদিগের ভক্তিবৃত্তিবিকাশের বহু উপায় ছিল, এখন তাহা গিয়াছে; সেই জন্যই দেশের এমন দুর্গতি হইয়াছে। যাহা হউক, এ দেশের ধার্ম্মিক মহাত্মারা, আচার অনুষ্ঠানের সহিত যদি এ দেশের

সাধারণ মহিলাদিগের মধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করেন, যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিজ পরিজনদিগের প্রাণে গভীর ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া কত মহিলার জীবন ধন্য হইতে পারে! নারী-হৃদয়ের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

কেবল ঈশ্বর-ভক্তি নহে, গুরু-ভক্তি, গুণি-ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা ভক্তিভাবের সম্পূর্ণ বিকাস না হইলে এ দেশের মহিলা-গণের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ভক্তির বাড়াবাড়ি আমরা "শ্রেষ্ঠতম" বলি না; ভক্তিভাজনের পাদোদক খাইলে অথবা ভক্তিভাজনের সম্মুখে মূক সাজিয়া থাকিলে আমরা ভক্তির পরাকাষ্ঠা মনে করি না; তবে সে সকল কাজে যাঁহার পরিতৃপ্তি জন্মে, তিনি করিতে পারেন। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে—"পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ" অর্থাৎ পূজনীয়ের প্রতি যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। পূজনীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে মানব-হৃদয় সহজেই বিনীত হয়। পারিবারিক গুরুজন মাতা পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী, শ্বশুর শাশুড়ী, ভাশুর প্রভৃতিকে ভক্তি করিবে, তাঁহাদের আদেশ মান্য করিবে; তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে, সকলের উপরে তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। বিদ্যাবতী কন্যার মাতা মূর্খ হইলেও তিনি কোনও মতে অবহেলনীয়া নহেন; জ্ঞানাংশে ত্রুটি থাকিলেও মাতৃত্বে তাঁহার সম্পূর্ণতা। সন্তান যতই মহৎ হউন না কেন, মাতার জন্যই তাঁহার দেহ ও জীবন। এইরূপ কথা—প্রত্যেক গুরুজনের বিষয়ে এইরূপ কথা মনে করিলে ভক্তি-বৃত্তি আপনা আপনিই অনুশীলিত হইবে, তাঁহাদের সহস্র ত্রুটি দেখিলেও মনে অভক্তির ভাব আসিবে না।

পারিবারিক ভক্তিভাজন ব্যক্তিগণ ব্যতীত ধার্ম্মিক, সাধু, উপকারী, সমাজ-শিক্ষক, স্বদেশভক্ত, বিশ্বহিতৈষী মহাত্মা মাত্রেই ভক্তিভাজন। ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতে পারাই ভক্তির উন্নতি; অন্যথা অবনতির পরিচায়ক।

এইখানে স্বামি-ভক্তির কথা দুই এক ছত্র লেখা আবশ্যক, কারণ সাময়িক বিপ্লবে এ দেশ হইতে তাহা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। সেকালে ভার্য্যাগণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে স্বামীর চরণামৃত পান করিয়াই কৃতার্থা হইতেন; একালে স্বামী "বন্ধু" বলিয়া ভার্য্যা তাঁহাকে ভক্তিভাজন মনে করিতে লজ্জিতা হন। আমাদের বোধ হয় সাধারণ মহিলাদিগের পতিপ্রেম তখন যেমন অসম্পূর্ণ ছিল, এখনও সেইরূপ অসম্পূর্ণ; কারণ ভক্তি ও প্রীতির সমবায়েই পতিপ্রেমের পূর্ণতা। রমণীর গুরুজনও স্বামী, বন্ধুও স্বামী; তাই স্বামীতে ভার্য্যার ভক্তিও চাই, প্রীতিও চাই; ভক্তি প্রীতি একত্রে না মিলিলে পতিপ্রাণতা জন্মে না। স্বামীকে ভক্তিও করিবে, প্রীতিও করিবে।

এইরূপে, প্রত্যেক ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতে পারিলেই রমণী-হৃদয় বিনীত

স্নিগ্ধ ও সুকুমার হইতে পারে। কর্কশতা বা উদ্ধত স্বভাব নারীজাতির পক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক। ভক্তি-ভাবের সম্প্রসারণেই তাহা দূর হইতে পারে। ইউরোপীয় "সাম্য" ভাবের আন্দোলনে এ দেশে অনেকের মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়াছে, সেই জন্যও ভক্তির বিষয়ে এ কয়টী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্বদেশীয়া ভগিনি! তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৬৬ সংখ্যা—৭১ পৃষ্ঠার পর)

চক্ষুরোগ।

১। করবী পাতার রস চক্ষুতে ফুট দিলে চক্ষু উঠা নিবারিত হয়।

২। অর্দ্ধ ছটাক গোলাপ জলে ২।৩ রতি ফট্‌কিরি দ্রব করিয়া তদ্দ্বারা বার বার চক্ষু প্রক্ষালন করিলে চক্ষু উঠা আরোগ্য হইয়া যায়।

৩। সজিনা পাতার রস তাম্রপাত্রে মর্দ্দন করিয়া, তাহাতে অল্প ঘৃত মিশাইয়া চক্ষে লেপ দিলে, চক্ষুর শোথ, কণ্ডু, বেদনা ও জলস্রাব নিবারিত হয়।

৪। টাটকা গোমূত্রে নারিকেলফুল বাটিয়া চক্ষুর চারি দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

৫। তিন চারি দিন সন্ধ্যাকালে ২।৩ ফোঁটা পানের রস চক্ষের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া, কিছুক্ষণ পরে শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে, রাতকাণা দোষ আরোগ্য হয়।

৬। সুমিষ্ট ডালিমের রস শিশিতে পূরিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া, চক্ষুতে দিলে নানাবিধ নেত্ররোগ নষ্ট হইয়া চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়।

৭। নূতন সরায় কাটখড়ি ও হরিদ্রা ঘসিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়। হরিদ্রামাখান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদিত রাখা হিতকর।

৮। পাঁটার মেটে ভাজিয়া দিনকতক আহার করিলে রাত্র্যন্ধতা ভাল হয়।

৯। মনঃশিলা, নাভিশঙ্খ, পিপুল ও রসাঞ্জন সমভাগে লইয়া মধু সহ মর্দ্দনপূর্ব্বক বাতি করিয়া গব্য ঘৃত সহ লৌহপাত্রে ঘর্ষণ করিবে, পরে প্রদীপের শিখায় ঐ লৌহপাত্র ধরিয়া রাখিলে যে অঞ্জন প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা শিশুদিগের চক্ষুর জলস্রাব, শোথ, রক্তিমতা ইত্যাদি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

১০। শিশুদিগের চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, প্রসূতির কিঞ্চিৎ স্তনদুগ্ধ ৪।৫ দিন প্রাতে প্রদান করিলে আরোগ্য হয়।

১১। পাতিলেবুর শিকড় উহার রসে বাটিয়া চক্ষুর নীচে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

১২। প্রস্তরময় পাত্রে স্তনদুগ্ধে হরিতকী ঘসিয়া সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে অঞ্জন দিবে এবং প্রাতে ২।১ বার পানের রসে বটের কচি পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ দিবে। ৬।৭ দিন এইরূপ করিলে রাত্র্যন্ধতা আরোগ্য হয়।

১৩। শ্বেত পুনর্ণবার মূল ও হরিদ্রা একত্র ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কদাচ চক্ষুতে কোনও রোগ জন্মিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

ধান্য।

(দ্বিতীয় পত্র)

আমন ধানের মধ্যে কতকগুলিকে ছোট্না বাগড়ে কহে। তাহা আশু ধান্যের গাছের ন্যায়। বিলকাঁদড়ে, চাতাল ও কুড়ি ক্ষেত্রে ঐ ধানের আবাদ হইতে পারে। ক্ষেত্রে অন্যূন অর্দ্ধহস্ত এবং অনধিক তিন হস্ত পরিমাণে জল দাঁড়াইলেই উহার আবাদ চলিতে পারে। যদিও জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তথাপি ক্ষেত্রের জল তিন হস্তের অধিক বৃদ্ধি পাইলে ঐ ধান জলে পচিয়া যায়। সুতরাং কৃষককে কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ঐ ধানের আবাদ করিতে হয়। ঐ সকল ছোট্না বাগ্ড়ের নাম; যথা, কোঁকো, ডেঙ্গাকুড়ি, কার্ত্তিকে ডেপু, দুধনাড়ী, কুঁচে, রোয়াকেলে, ডহরনাগরা, মেঘলাল, আঁধারমাণিক, দেবমুনি, আয়দা ইত্যাদি।

বাগ্ড়ে আমনের আর কতকগুলির নাম বরাণ। উহাদের প্রকৃতিতে পরমেশ্বরের অপার কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। ঐ সকল ধান্য জলমগ্ন হইয়াও আপনাকে জীবিত রাখিয়া জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। উহাদের মধ্যে কোন কোন ধান বিশ হাত জলের উপর ভাসিতে সমর্থ হয়। যে ক্ষেত্রের জলের উচ্চতা যেরূপ হয়, সেই ক্ষেত্রে রোপণ করিবার উপযুক্ত ধান উহাদের মধ্যে আছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা বিবৃত করিতেছি। উহাদের মধ্যে কৃষ্ণকলি, মুক্তাহার, ছোটদীঘে, বড়দীঘে, নেতা, ধলি, পিত্তরাজ, কেয়ারশালী, ফুল আমলা, পুদি, কলমা, ঝ্যাপো, লাল কানাই, মেহেরফল, হাসবত, কালবয়রা, পানত্রাস, মেঘি ইত্যাদি। বর্ষাবারি কি বন্যাবারি দ্বারা

পূর্ণ বিলান জমি, অথবা বিলাদি জলাশয়ের রই ভিন্ন অন্যবিধ ক্ষেত্রে ঐ ধান ভাল হয় না। উহার মূলে অল্প মাত্রায় জল বদ্ধ হইলে বিশেষ উপকার হয় না। অন্যূন দুই তিন হাত জলের উপর না ভাসিতে পাইলে উহার স্ফূর্ত্তি হয় না। হঠাৎ অতিবৃষ্টি হইয়া, কি নদীর বন্যা আসিয়া ঐ ধান্যের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে জল জমিয়া গেলে উহার অনিষ্ট হয়। নচেৎ ক্রমে ক্রমে জল বাড়িলে উহার কোন অনিষ্ট হয় না। ক্ষেত্রের জল যদি ঘোলা না থাকে এবং বিলক্ষণ রৌদ্রের দীপ্তি পায় ও সেই কালে ঝড় তুফান না থাকে, তাহা হইলে ঐ ধান ২।৩ হাত জলের নিম্নে থাকিয়া পাতা ফেলে এবং অল্প দিনের মধ্যে জলের উপর জাগিয়া উঠে।

বাগুড়ে বরাণ ধান্যের প্রকৃতিতে বিশ্বস্রষ্টার কিরূপ সৃষ্টিকৌশল নিহিত আছে, তাহা দেখাইবার কথা আছে। বিশিষ্ট প্লাবন ব্যতীত এই ধান্য জন্মে না। বিল বা অন্যবিধ জলাক্ষেত্রের কিনারা হইতে রই পর্য্যন্ত জলের গভীরতা নানাবিধ অর্থাৎ দুই এক হস্ত হইতে বার চৌদ্দ হস্ত পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব। ঐ বিভিন্ন প্রকার জলাক্ষেত্রে জন্মিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার ধান্য আছে। যেখানে দুই হাত পরিমিত জল, সেখানে কার্ত্তিক ডেপু নামক ধান জন্মে। যেখানে তিন হাত জল, সেখানে দেবমুনি ও দুধনাড়ী নামক ধান হয়। এইরূপ জলের পরিমাণ চারি হাত হইলে কৃষ্ণকলি; পাঁচ হাত হইলে, ছোটদীঘে ও বড়দীঘে; ছয় হাত হইলে, নেতো ও ধলি; সাত হাত জল হইলে, পিত্তরাজ; আট হাতের ক্ষেত্রে মুক্তাহার ও কেয়ার শাল; নয় হাত জল হইলে, হাসবত এবং দশ হাত জল হইলে, কালবয়রা ইত্যাদি ক্রমে জন্মিয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে আধ হাত তিন পোয়ার অধিক জল বাঁধে না, তাহাতে ডেঙ্গাকুড়ি, কেঁকো, আঁধারমাণিক ও আয়দা ধান জন্মিয়া থাকে। জলাক্ষেত্রের অবস্থাভেদে যে কত প্রকার ধান জন্মিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। কৃষকেরা অনুমান করেন, উহার সংখ্যা সহস্রাধিক। আমাদেরও এ কথায় অবিশ্বাস হয় না। উপরি-উক্ত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত না হইলেও যাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, আমাদের ভরসা হয়, এতৎপাঠে কৃষকের উপকার হইতে পারে। ঐ সকল ধানের প্রায়ই "দোমুট" বুনানি হইয়া থাকে। "দোমুট" বুনানি কাহাকে বলে, তাহা পরে বলিব।

অনেক স্থলে বরাণ ধানের "বাওড়া" বুনানি হয়। একেবারে বপন হইতে ধান জন্মে, রোপণের প্রয়োজন হয় না, তাহাকে "বাওড়া" কহে। বিলান জমি জ্যৈষ্ঠ মাসের জলে প্রায়ই ডুবিয়া যায়। যে বার না ডুবে, সেই বারই উহাতে ধান পাওয়া যায়।

"হাতে কাটা, বাধে বিশ।"

কৃষকেরা এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া ঐরূপ জমিতে ধান করে। উহাতে দুইবারের অধিক চাষ দিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়

মাসের বন্যায় জলমগ্ন না হইয়া যদি ঐ ধান একবার জলের উপর ভাসিয়া উঠে, তবে আর উহার বিনাশ নাই। জলজ বন বা শৈবালাদিতে উহার হানি করিতে পারে না। বিঘা প্রতি উহার বীজ পরিমাণে ১০।১২ সেরের অধিক নহে। কাটিবার সময় উহার গোড়া কাটিবার সুবিধা হয় না, আগা হইতে এক, কি দেড় হাত কাটিয়া লয় এবং উহা মাড়াই করিলে পরিষ্কার ধান্য পাওয়া যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ছোটনা বাগুড়ের বীজ ও আশু ধান্যের বীজ সমপরিমাণে বপন করা হয়, তাহাকে "ম্বেমুট" বুনানি কহে। এই প্রণালীর বিশেষ লাভ এই, বৎসর ভাল হইলে, উভয় ধান্যই অধিক পরিমাণে ফলে। কিন্তু আউশ ধানের পোয়াল বা বিচালি নষ্ট হইয়া যায়। কারণ আউশ ধান যখন পাকে, তখন আমন পাকে না, সুতরাং আউশ ধানের গোড়া কাটিবার উপায় থাকে না, কেবল শিষ কাটিয়া লইতে হয়। এইরূপে যে ক্ষতি হয়, পোয়াল পচিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া তদপেক্ষা অধিক লাভ হয়, কেননা আমন কাটার পর ঐ ক্ষেত্রে প্রচুর হরিৎখন্দ জন্মে। ছোট্‌না বাগড়ে রোপণপ্রণালীতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ময়মনসিং অঞ্চলে যে সকল ধান্য জন্মে, তাহাদিগকে পূরবী ও মুগী কহে। বালাম, বাখরগঞ্জ ও বরিশাল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্ট প্রদেশে এক প্রকার ধান্য জন্মে, তাহার নাম হরিনারায়ণ, উহা অতি উৎকৃষ্ট।

এ দেশে আর এক প্রকার ধান্যের আবাদ হইয়াছে, তাহার নাম কারোলিনা। উহা উত্তর আমেরিকার কারোলিনা প্রদেশ হইতে আনীত। উৎপত্তিস্থানের নাম অনুসারে ঐ ধান্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার চাষ আবাদের বিশেষ সুবিধা এই যে, বৎসরের মধ্যে উহার ক্ষেত্রে দুই বার ধান ফলে। এক বার অগ্রহায়ণ মাসে পাকে। কিঞ্চিৎ গোড়া রাখিয়া ধান কাটিয়া লইয়া ঐ গোড়ায় একবার জল সিঞ্চন করিতে হয়। সিঞ্চনের কিছুদিন পরে প্রত্যেক গোড়ার চারি পাশ হইতে বহুসংখ্যক বোগ বাহির হইয়া তাহাতে উৎকৃষ্টরূপে ধান্য ফলে। উহা মাঘ ফাল্গুন মাসে পাকিয়া উঠে। কারোলিনার চাষ আবাদের বিশেষ বাহুল্য নাই।

আমরা এই প্রবন্ধের ধান্য প্রকরণে "বোরো" ও "জলি" নামে আর দুই প্রকার ধানের নাম করিয়াছি। এই স্থলে তাহাদেরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক। বোরো ধান্য অন্যান্য ধান্য হইতে নিকৃষ্ট হইলেও উহার দুইটী বিশেষ গুণ আছে। উহা বার মাসই জন্মে এবং উহার ফলন সকল ধান হইতে অধিক। বোরো বিঘা প্রতি বোল মণেরও অধিক ফলিয়া থাকে। উহা সর্ব্বত্র একই প্রকার। উহার ছোট্‌না, বরাণ ইত্যাদি কোন প্রকারভেদ নাই। উহার গাছ দুই কি আড়াই হাতের অধিক উচ্চ হয় না।

বোরোর স্বাভাবিক বর্ণ কৃষ্ণ; কিন্তু কখন কখন উহা শ্বেতবর্ণও হইয়া থাকে। এক শিষে শ্বেত ও কৃষ্ণ, উভয় বর্ণই লক্ষিত হয়। উহার অন্ন ভাল সিদ্ধ হয় না, আউস চাউলের অন্নের ন্যায় খস্‌খসে হয়। উহার আবাদ বপন ও রোপণ এই উভয় প্রণালীতেই হইয়া থাকে। বিল,পুষ্করিণী বা অন্যবিধ জলাভূমির মধ্যে যে সকল কর্দ্দমময় ক্ষেত্র থাকে, তদ্ভিন্ন অন্যবিধ ভূমিতে রোয়া বোরা জন্মে না। উহার রোপণ-প্রণালী আমনেরই ন্যায়, কেবল আমন অপেক্ষা বোরোর গুছিতে চারা কিছু বেশি থাকা আবশ্যক, এবং উহার রোপণও কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। উহার বীজ প্রস্তুতকরণে ও ক্ষেত্রের চাষ আবাদে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা যথাস্থলে বলিব। বপন দ্বারা যে বোরো ধান্য জন্মাইতে হয়, তাহা কুড়ি ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জন্মে না। আশু ধান্যের রীত্যনুসারে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উহা বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি ।৬ সের বীজ লাগে। রোপণের বীজ ৴৪ সেরের অধিক লাগে না। বোরোর সহিত আশু ধান্যের একটু সম্বন্ধ দেখা যায়। বোরোর বীজাভাব হইলে "সুনিকেলে" নামক আশু ধানের বীজ পাতিয়া রোপণ করিলে তাহা হইতে উত্তম বোরো ধান্য জন্মে। কেহ কেহ বলেন, আশু হইতেই বোরোর উৎপত্তি। আমাদের বিবেচনায় বোরো ধানই উচ্চ ভূমিতে উপ্ত হইয়া চাষ আবাদের প্রভাবে রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া "সুনিকেলে" নামক আশু ধান্য জন্মিয়াছে। বোরোর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যে সকল বোরো চৈত্র মাসে পাকে, তাহা কাটার পর গোড়া হইতে কারোলিনা ধানের ন্যায় বোগ বাহির হইয়া ২।২॥ মণ ধান জন্মে। ঐ সকল বোগকে "কেচেটি" কহে। "কেচেটির" অন্য কোনরূপ আবাদ করিতে হয় না।

জলি, এক প্রকার পৃথক্ ধান্য নহে। উহা ছোট্‌না আশুরই প্রকারান্তর মাত্র। চির-জলার্দ্র ভূমিতে জন্মে বলিয়া উহাকে জলি কহে। জলি ধানের ভূমি ও চাষ আবাদ একটু গোলমেলে। পঙ্কিল ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ হইলে তাহা কঠিন হইয়া উঠে। এই পঙ্কিল ভূমির একদিকে উচ্চ ভূমি ও আর দিকে জলাশয়। উচ্চ ভূমির রস চোয়াইয়া ঐ পঙ্কিল ক্ষেত্রে আইসে এবং নিকটে জলাশয়ের অবস্থান প্রযুক্ত তথায় উত্তাপেরও তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় না; সুতরাং ঐ পঙ্কিল ভূমি চিরকালই আর্দ্র থাকে। ঐরূপ ভূমিতে বিঘা প্রতি ।২ সের হিসাবে ছোট্‌না আশুর বীজ বপন করিলেই স্বাভাবিকরূপে চারা বাহির হইয়া ধান্য জন্মে। তাহাকেই জলি ধান কহে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে উহার বুনানি হয় ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উহা পাকিয়া উঠে। জলির পাক নামি হইলে প্রায়ই নদী বা বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়। বাঁধ দিয়া নদীর জল নিবারণ করিতে পারিলেও আকাশ বর্ষা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। বিদা ভিন্ন আর সকল চাষই আশু ধান্যের

ন্যায়। জলির ক্ষেত্র পঙ্কিল বলিয়া উহাতে বিদা চলে না। উহার আবাদ বোরোর ন্যায় বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতেই হইয়া থাকে। মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথমে বীজ পাতিয়া ফাল্গুনের শেষে বা চৈত্রের প্রথমে চারার গুছি রোপণ করিতে হয়। উপ্ত ও রোপিত উভয় বিধ ধান্যই এক সময়ে পাকে। বসন্ত ঋতুর বাতাস না পাইলে উহার গাছ তেজস্বী হয় না। নদীতে জোয়ারের জল যত দূর উঠে এবং ভাঁটার সময় উহার জল যতদূর নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমান্তর্গত পললময় ক্ষেত্রেও জলির আবাদ হইয়া থাকে।

"স্বরা আশু" নামে আর এক প্রকার ধান্য আছে। উহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা স্বরা, মুকো, ঝাটি ও নেওয়ালি। এই ধানের সকল প্রকার সত্বর পরিপক্ক হয় না এবং উহা আশু ধান্যের মধ্যেও পরিগণিত নহে; তথাপি উহার নাম "স্বরা আশু"। ইহার রোপণ ভিন্ন বপন প্রথা প্রচলিত নাই; কারণ উহা রাঢ়ি অঞ্চলের ন্যায় কুড়ি প্রভৃতি জলাভূমিতে জন্মে, তথায় বিদা চালাইবার সুবিধা হয় না। বিদা ভিন্ন উপ্ত ধান্যের চারা তেজস্বী হয় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পাতিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষ ও আষাঢ়ের প্রথম এই এক মাসের মধ্যে উহা রোপণ করিতে হয়। ৵৫ পাঁচ সের বীজে এক বিঘার রোপণকার্য্য শেষ হইতে পারে। স্বরা ভাদ্র মাসে পাকে, মুকো ও ঝাটি আশ্বিন মাসে এবং নেওয়ালি কার্ত্তিক মাসে পাকে। দার্জিলিং অঞ্চলে শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে উহা দুই প্রকার হয়। তত্রত্য অধিবাসিগণ উহাকে "ভাদুই" ধান্য কহে। ঐ অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ ধান গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যান্য ধান্যের ন্যায় শিষের আকার ধারণ করে না, গর্ভমধ্যেই পাকিয়া যায়।

বঙ্গদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলে শ্যামা, চিনে, কাউন বা ভুয়ো, মাড়ুয়া, শেয়াললেজা, কোদো প্রভৃতি আরও কয় প্রকার ধান্যজাতীয় শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা অতি অল্লায়াসেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল শস্যের বীজের আকার প্রায় গোল এবং চাউল প্রায় খুদের ন্যায়। উহা গো, মহিষ ও পক্ষিগণের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তবে উহার মধ্যে কোন কোন শস্য নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিগণও আহার করিয়া থাকে। গো মহিষগণকে উহাদের শস্য না খাওয়াইয়া ঘাসরূপে গাছ খাওয়ান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কোদোর বীজ গোরুকে খাওয়াইলে তাহাদের ঘোর লাগে।

কখন কখন আশু ধান্যের ক্ষেত্র নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে ধান ফলে না। ঐ সকল ক্ষেত্রে ২।৩ বার চাষ দিয়া ঐ সকল শস্য বপন করিতে হয়। বপনের পর আর কোন চাষ আবাদের প্রয়োজন হয় না। তবে কোন কোন শস্যে ২।১ পালা বিদে বাঁশী দিতে হয়। তাহা এই স্থলেই বলিতেছি।

ভুয়ো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিলে

বোরোর স্বাভাবিক বর্ণ কৃষ্ণ ; কিন্তু কখন কখন উহা শ্বেতবর্ণও হইয়া থাকে। এক শিষে শ্বেত ও কৃষ্ণ, উভয় বর্ণই লক্ষিত হয়। উহার অন্ন ভাল সিদ্ধ হয় না, আউস চাউলের অন্নের ন্যায় খস্‌খসে হয়। উহার আবাদ বপন ও রোপণ এই উভয় প্রণালীতেই হইয়া থাকে। বিল,পুষ্করিণী বা অন্যবিধ জলাভূমির মধ্যে যে সকল কর্দ্দম-ময় ক্ষেত্র থাকে, তদ্ভিন্ন অন্যবিধ ভূমিতে রোয়া বোরা জন্মে না। উহার রোপণ-প্রণালী আমনেরই ন্যায়, কেবল আমন অপেক্ষা বোরোর গুছিতে চারা কিছু বেশি থাকা আবশ্যক, এবং উহার রোপণও কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। উহার বীজ প্রস্তুত-করণে ও ক্ষেত্রের চাষ আবাদে কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা যথাস্থলে বলিব। বপন দ্বারা যে বোরো ধান্য জন্মাইতে হয়, তাহা কুড়ি ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জন্মে না। আশু ধান্যের রীত্যনুসারে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উহা বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি।৬ সের বীজ লাগে। রোপণের বীজ /৪ সেরের অধিক লাগে না। বোরোর সহিত আশু ধান্যের একটু সম্বন্ধ দেখা যায়। বোরোর বীজাভাব হইলে "সুনিকেলে" নামক আশু ধানের বীজ পাতিয়া রোপণ করিলে তাহা হইতে উত্তম বোরো ধান্য জন্মে। কেহ কেহ বলেন, আশু হইতেই বোরোর উৎপত্তি। আমাদের বিবেচনায় বোরো ধানই উচ্চ ভূমিতে উপ্ত হইয়া চাষ আবাদের প্রভাবে রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া "সুনিকেলে" নামক আশু ধান্য জন্মিয়াছে। বোরোর আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যে সকল বোরো চৈত্র মাসে পাকে, তাহা কাটার পর গোড়া হইতে কারোলিনা ধানের ন্যায় বোগ বাহির হইয়া ২।২॥ মণ ধান জন্মে। ঐ সকল বোগকে "কেচেটি" কহে। "কেচেটির" অন্য কোনরূপ আবাদ করিতে হয় না।

জলি, এক প্রকার পৃথক্ ধান্য নহে। উহা ছোট্‌না আশুরই প্রকারান্তর মাত্র। চির-জলার্দ্র ভূমিতে জন্মে বলিয়া উহাকে জলি কহে। জলি ধানের ভূমি ও চাষ আবাদ একটু গোলমেলে। পঙ্কিল ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ হইলে তাহা কঠিন হইয়া উঠে। এই পঙ্কিল ভূমির একদিকে উচ্চ ভূমি ও আর দিকে জলাশয়। উচ্চ ভূমির রস চোয়াইয়া ঐ পঙ্কিল ক্ষেত্রে আইসে এবং নিকটে জলাশয়ের অবস্থান প্রযুক্ত তথায় উত্তাপেরও তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় না। সুতরাং ঐ পঙ্কিল ভূমি চিরকালই আর্দ্র থাকে। ঐরূপ ভূমিতে বিঘা প্রতি।২ সের হিসাবে ছোট্‌না আশুর বীজ বপন করিলেই স্বাভাবিকরূপে চারা বাহির হইয়া ধান্য জন্মে। তাহাকেই জলি ধান কহে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে উহার বুনানি হয় ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে উহা পাকিয়া উঠে। জলির পাক নামি হইলে প্রায়ই নদী বা বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়। বাঁধ দিয়া নদীর জল নিবারণ করিতে পারিলেও আকাশ বর্ষা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। বিদা ভিন্ন আর সকল চাষই আশু ধান্যের

ন্যায়। জলির ক্ষেত্র পঙ্কিল বলিয়া উহাতে বিদা চলে না। উহার আবাদ বোরোর ন্যায় বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতেই হইয়া থাকে। মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথমে বীজ পাতিয়া ফাল্গুনের শেষে বা চৈত্রের প্রথমে চারার গুছি রোপণ করিতে হয়। উপ্ত ও রোপিত উভয় বিধ ধান্যই এক সময়ে পাকে। বসন্ত ঋতুর বাতাস না পাইলে উহার গাছ তেজস্বী হয় না। নদীতে জোয়ারের জল যত দূর উঠে এবং ভাঁটার সময় উহার জল যতদূর নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমান্তর্গত পললময় ক্ষেত্রেও জলির আবাদ হইয়া থাকে।

"স্বরা আশু" নামে আর এক প্রকার ধান্য আছে। উহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা স্বরা, মুকো, ঝাটি ও নেওয়ালি। এই ধানের সকল প্রকার সত্বর পরিপক্ব হয় না এবং উহা আশু ধান্যের মধ্যেও পরিগণিত নহে; তথাপি উহার নাম "স্বরা আশু"। ইহার রোপণ ভিন্ন বপন প্রথা প্রচলিত নাই; কারণ উহা রাঢ়ি অঞ্চলের ন্যায় কুড়ি প্রভৃতি জলাভূমিতে জন্মে, তথায় বিদা চালাইবার সুবিধা হয় না। বিদা ভিন্ন উপ্ত ধান্যের চাষ তেজস্বী হয় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পাতিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষ ও আষাঢ়ের প্রথম এই এক মাসের মধ্যে উহা রোপণ করিতে হয়। ৵৫ পাঁচ সের বীজে এক বিঘার রোপণকার্য্য শেষ হইতে পারে। স্বরা ভাদ্র মাসে পাকে, মুকো ও ঝাটি আশ্বিন মাসে এবং নেওয়ালি কার্ত্তিক মাসে পাকে। দার্জিলিং অঞ্চলে শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে উহা দুই প্রকার হয়। তত্রত্য অধিবাসিগণ উহাকে "ভাদুই" ধান্য কহে। ঐ অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ ধান গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যান্য ধান্যের ন্যায় শিষের আকার ধারণ করে না, গর্ভমধ্যেই পাকিয়া যায়।

বঙ্গদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলে শ্যামা, চিনে, কাউন বা ভুরো, মাড়ুয়া, শেয়াললেজা, কোদো প্রভৃতি আরও কয় প্রকার ধান্যজাতীয় শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা অতি অনায়াসেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল শস্যের বীজের আকার প্রায় গোল এবং চাউল প্রায় খুদের ন্যায়। উহা গো, মহিষ ও পক্ষিগণের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তবে উহার মধ্যে কোন কোন শস্য নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিগণও আহার করিয়া থাকে। গো মহিষগণকে উহাদের শস্য না খাওয়াইয়া ঘাসরূপে গাছ খাওয়ান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কোদোর বীজ গোরুকে খাওয়াইলে তাহাদের ঘোর লাগে।

কখন কখন আশু ধান্যের ক্ষেত্র নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে ধান ফলে না। ঐ সকল ক্ষেত্রে ২।৩ বার চাষ দিয়া ঐ সকল শস্য বপন করিতে হয়। বপনের পর আর কোন চাষ আবাদের প্রয়োজন হয় না। তবে কোন কোন শস্যে ২।১ পালা বিদে বাঁশী দিতে হয়। তাহা এই স্থলেই বলিতেছি।

ভুরো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিলে

শ্রাবণ ভাদ্রে পাকে। বীজ ⁄১ এক সের ⁄১৷ পাচ পোয়ার অধিক লাগে না। বপনের পর দুই পালা মই দিতে হয়। কোদোর চাষ আবাদ ও বীজ পরিমাণে ঐরূপ। ইহারও শীষ বাহির হয় না, গর্ভমধ্যে পাকিয়া থাকে। শেয়াললেজার শীষ ঠিক্ শৃগাল-লাঙ্গুলবৎ; চাষ আবাদ ঠিক ভুরোর ন্যায়। মাতুয়াতে মণ্ড প্রস্তত হয়; এজন্য পার্ব্বতীয় প্রদেশে অতি আদরে উহার চাষবাস হইয়া থাকে। উহার চাষ আবাদ আমন ধানের ন্যায় বপন ও রোপণ উভয় প্রণালীতে হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত চীনার বুনানি হয়। বুনানির পর বাইট দিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে। বীজের পরিমাণ ⁄১ এক সের ⁄১৷ পাঁচ পোয়া।

বিজলী সখী।

১

মরতে এ ঘন তমসায়,
আয় মোর রাঙা দিদি আয়;
নব ঘন-ঘটা ছাড়ি,
আয় রাণি, মোর বাড়ী,
ব'সে থাকি দুই বোনে গলায় গলায়;
তুমি রাঙা, আমি কালো,
মিলিলে মানাবে ভাল,
উজলে সোণার চিক্ রেশমী ফিতায়!
আয় মোর রাঙা দিদি আয়!

২

অই দিব্য হাসিমাখা মুখ,
মাখা যেন ত্রিদিবের সুখ;
আঁধার আঁধার পর
ঘন আঁধারের স্তর,
আঁধারে আঁধারে নাহি ফাঁক একটুক!
তুমি ভেদি সে আঁধার,
হাসাইলে ত্রিসংসার,
এতই আনন্দে ভরা দেবতার বুক!

৩

তোমার ও স্বরগের হাসি,
আমি ভাই, বড় ভালবাসি,
কেমন বিভল-পারা,
হ'য়ে পড়ি মাতোয়ারা,
মরমে বাজিয়া ওঠে মল্লারের বাঁশি!
যদি বল বজ্রনাদে,
বালক সভয়ে কাঁদে,
যদিও মানব-হিয়া চমকে তরাসি,
তবু দেখ, পূজিবারে
অসি-করা শ্যামা মা'রে,
কত আয়োজন করে ধরাতল-বাসী,
পবিত্রতা বীরতায় কে না অভিলাষী?

৪

তাই, দেবী, তোমারে হেরিয়া,
যায় বিশ্ব পুলকে গলিয়া!
শ্যামল তরুর মূলে
শিখী নাচে পাখা খুলে,
আবাহন করে ভেক শাঁখ বাজাইয়া;

চাতক মহান্ স্বরে,
তোমারে বন্দনা করে,
বসুধা সহস্র প্রাণে উঠে উথলিয়া!

৫

চিরকাল কালো মেঘে বাস,
আকাশেরও কালিমা বাতাস;
সবি হেন কালো কালো,
তবু তব রূপে আলো,
খনির আঁধারে যথা মণির বিকাস!
আমি তো কনক-লতা!
বুঝি না এ সব কথা,
তুমি কে অমৃতময়ী, অমৃত নিশ্বাস?

৬

শুনিয়াছি বজ্রের অনলে,
তব হৃদি চিরদিন জ্বলে!—
কে জানে বিধির আশ,
পদ্মবনে ফণি-বাস!
সুন্দর চন্দ্রমা কেন রাহুর কবলে?—
অথবা পরশে তব,
বজ্র, মহাবজ্র, সব,
শীতল তুষার যথা হিমাচল-তলে!

৭

যতক্ষণ তব বুকে রয়,
ততক্ষণ বজ্রে কিবা ভয়?—
কিন্তু হায়, কি অদ্ভুত,
হ'লে ও হৃদয়-চ্যুত,
অনল উগারে বাজ মহামৃত্যুময়!
শঙ্করে পরশি যথা,
কালকূট সুধা—তথা
তোমারে পরশি বজ্র স্নিগ্ধ, সুধা হয়!

৮

এস দেবি, ভূতল উপরে,
মানবের অগ্নিময় ঘরে;
তোমার অমিয় বা'য়
লাগিয়া বিষাক্ত গায়,
হাসুক মলয়ানিল শুষ্ক বন-পরে!
হোক্ বজ্রানল শান্তি,
যা'ক্ হাড়ভাঙ্গা শ্রান্তি,
বহুক পীযূষধারা প্রাণের ভিতরে!

৯

দেবী তুমি স্বরগ-শোভনা,
জান না তো নরের বেদনা!
কি কহিব সুরেশ্বরি,
সদা মোরা বেঁচে মরি,
নীরবে শুকায় কত পবিত্র কামনা!
কি শুনিবে বিধুমুখি,
শত সুখে মোরা দুখী,
সদাই নিরাশা আনে মরণ-যাতনা!

১০

তাই ডাকি, মরতে আসিয়া,
এ বেদনা দাও ভুলাইয়া;
নিয়ে হাসি মুখখানি,
যদি কাছে এস রাণি,
প্রাণের জ্বলন্ত বহ্নি যাইবে নিভিয়া!
দাও দেবী, এই বর—
অভাগা অধম নর
তোমারি মতন হাসি, উঠুক হাসিয়া!
অমনি পবিত্র আলো,
তাদেরো মরমে ঢালো,
পাপ, তাপ, মলিনতা, যাউক মুছিয়া!
শান্ত যাহে বজ্রানল

দাও সেই হৃদি-তল,
মানবে দেবতা হ'তে দাও শিখাইয়া !
তোমারি বাতাসে ধরা,
হউক অমিয়-ভরা,
নরের অমর প্রাণ উঠুক জাগিয়া !

১১

মরতের আঁধারের ছায়,
আর মোর রাঙা দিদি আয় !
শ্যাম জলধরে ছাড়ি,
এস সখি, মোর বাড়ী,
প্রীতির অঞ্চলে মন, বসা'ব তোমায় ;
এ জগতে রাঙা কালো,
চিরকাল মিলে ভাল,
শিবের সোণার আভা শ্যামা মা'র গা'য় !
আয়, মোর দিদিমণি ! আয়।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

গ্রীক পুরাণ।

(৩৬৩ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

দেব, দেবী, দৈত্য, পরী এবং অসংখ্য অসুর পরিবার লইয়া স্বর্গরাজ ক্রণস্ (শনি) রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ভগিনী রিয়ার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়া অনেকগুলি দেব দেবী উৎপন্ন হয়। স্বর্গরাজের সন্তান বলিয়া অন্য দেবতাদিগের উপর তাঁহাদের প্রাধান্য। তিনটী কন্যার নাম হেষ্টিয়া বা বেষ্টা, ডেমিটার বা সিরিস (লক্ষ্মী) এবং হীরা বা জুনো। তিনটী পুত্রের নাম হেডস বা প্লুটো (যমরাজ), পোসাইডন, নেপচুন (বরুণ) এবং জিয়স (ইন্দ্র) ; জিয়স সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও বুদ্ধি ও পরাক্রমে সকলের শ্রেষ্ঠ। এই সন্তানগণ অনেক কষ্টে জীবন লাভে সমর্থ হন। ক্রণস্ ভবিষ্যবাণী শুনিয়াছিলেন যে, তিনি যেমন তাঁহার পিতা ঊরেনস্‌কে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার এক সন্তান তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবে। ক্রণস্ সেই জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গ্রাস করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার পত্নী রিয়া পিতামাতার (ঊরেনস ও গায়া) সহিত পরামর্শ করিয়া একটী কৌশল অবলম্বন করেন, তাহাতেই কনিষ্ঠ সন্তান জিয়সের প্রাণরক্ষা হয়। ইহাঁর জন্মমাত্র ক্রণস্ ইহাঁকে গ্রাস করিতে আইসেন, কিন্তু সন্তানের পরিবর্ত্তে বস্ত্রাবৃত এক খণ্ড প্রস্তর তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং তিনি তাহাই গ্রাস করিয়া ভ্রমে মনে করিলেন কনিষ্ঠ সন্তানকেও উদরস্থ করিয়াছেন। এ দিকে দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জিয়স্‌কে স্থানান্তরিত করিয়া ক্রীট দ্বীপের আইডা পর্ব্বতে রাখা হয়। তিনি সেখানে জঙ্গলের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত

হইয়া উঠেন। তিনি এক দিন পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া কৌশলক্রমে তাঁহাকে কবলিত প্রস্তরখণ্ড* বমন করিতে বাধ্য করেন, এবং ক্রণস্ ক্রমে ক্রমে পাঁচটী সন্তানকেও উগারিয়া বাহির করেন। আপনার ভাই ভগিনীদের সহায়তায় জিয়স পিতৃরাজত্ব পর্য্যুদস্ত করিয়া নূতন দেবরাজ্য স্থাপনে স্থিরসঙ্কল্প হন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রণস্ এবং তাঁহার ভাই ভগিনী অসুরদল এক দিকে, জিয়স এবং তাঁহার ভাই ভগিনী ও ক্রণসের বিপক্ষ কতকগুলি প্রাচীন দেবতা অন্য দিকে। মিত্র-সৈন্যদিগের প্রধান ষ্টিংক্স দেবী ও তাঁহার ৪ পুত্র; ওজন সাইক্লপ্স (এক চক্ষু দানবী), ইহারা ইন্দ্রের জন্য বজ্র প্রস্তুত করেন; এবং তিনটী হিকাট-চারীস (শতহস্তী), ইহারা অমিতবলে দেবপক্ষ সমর্থন করে। দশ বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। জিয়স সদলে অলিম্পস্ পর্ব্বতে এবং দানবেরা অথ্রিস পর্ব্বতে সেনানিবেশ করেন। প্রকৃতিরাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। ওসেনস্ এই যুদ্ধে কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিলেও দূর হইতে ইহার কোলাহলে ও ঘাত-প্রতিঘাত-ধ্বনিতে অস্থির হন, গায়া ও পন্টসেরও সেই অবস্থা হয়। জিয়সের বজ্র ও শতহস্তীদিগের নিক্ষিপ্ত পাহাড় পর্ব্বত-খণ্ডের তাড়নে অবশেষে দানবেরা পরাভূত হইয়া টারটেরসে (পাতালপুরীতে) প্রবিষ্ট হয়। ক্রণস প্রভৃতি এই অন্ধকারাগারে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হন, নেপচুন ইহার চারি দিকে বিশাল পিত্তলের প্রাচীর গাঁথিয়া দেন এবং তিনটী শতহস্তী দিক্পালের ন্যায় তাহাদের প্রহরীরূপে স্থাপিত হয়। ওসেনস্ দেবতাগণের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই বলিয়া দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান। আয়াপুটস অসুর স্বপুত্র মিনিসিয়সের সহিত কারাবদ্ধ হয়। তাহার অন্য পুত্র আট্‌লাসের উপর এই দণ্ডাজ্ঞা হয় যে, সে জগতের পশ্চিম প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিবে। জিয়স আর এক শত্রুকে পরাজয় না করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা গায়া সন্তানপ্রসবে ক্লান্ত নহেন। তিনি পূর্ব্বে ঊরেণস ও পোণ্টসকে যেমন বিবাহ করিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ টার্টেরসকে বিবাহ করিলেন। টাইফিয়স নামে এক মহাদৈত্য গায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল। ইহা দ্বারা দেবরাজ্যের সমূহ উপদ্রব হইত। কিন্তু জিয়স বজ্রাগ্নিতে তাহাকে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া পাতালপুরীতে বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

(ক্রমশঃ)

* এই প্রস্তরখণ্ড ডেলফি মন্দিরে স্থাপিত হয় এবং গ্রীকেরা অনেক কাল ভক্তিভাবে ইহার পূজা করিতেন।

গৃহীর ধর্ম্ম।

প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আত্মজ্ঞান লাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে আত্মার অন্তরতম পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। একটী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিল, আর একটী পশু জন্মগ্রহণ করিল। দুইটীর পৃথিবীতে জন্ম হইল বটে, কিন্তু পশুর জীবন কেবল আহারবিহারে পর্য্যবসিত হইল, আর মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব সকল প্রস্ফুটিত হইল, সেই সঙ্গে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথও প্রশস্ত হইল। মানবহৃদয়ে প্রেয় ও শ্রেয়ঃ, পশু ও দেবভাবের অহরহঃ তুমুল দ্বন্দ্ব চলিল, একজন তাহাকে আপাত-মনোরম বিষয়ভোগ সকলে সবলে আকর্ষণ করিতেছে, আর একজন শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। সেই পথই ঈশ্বরে যাইবার পথ, যে পথে শ্রেয়ঃ যাইতে বলিতেছে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সমস্ত মনুষ্য যদি গৃহী না হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হইত না; তাই করুণাময় পরমেশ্বর মায়ায় বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে, মনুষ্য তাহা সহজে ছিন্ন করিতে পারেন না। সেই বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, বাল্যে পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীতে পরিবৃত হইয়া জীবনের প্রাতঃকাল সুখে অতিবাহিত হইয়া যায়, এবং যৌবনের প্রারম্ভে জীবন-মধ্যাহ্নে বিবাহিত হইয়া দুইটী প্রাণ এক হইয়া যায়; তখন অর্দ্ধ পূর্ণ হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগের হাতে গুরুতর কর্ত্তব্যভার দিবেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রাণে তাঁহার পালনী শক্তি যোগ করিয়া দেন। তখন এক দিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের কঠোরতা, অপর দিকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল আপাতসুখকর; এই সময়ে দেবভাবের ও পশুভাবের জয়-পরাজয়ের সময় বড়ই শক্তির প্রয়োজন। তাই করুণাময় পরমেশ্বর যে দেব-শক্তি প্রাণে যোজনা করিয়া দেন, তাহাতে অপূর্ণ জীব পূর্ণ হয়। এই কর্ত্তব্যের টানে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সুখকর বস্তু হইতে আপনাকে নির্লিপ্তভাবে রাখিতে পারিল, সেই জিতিয়া গেল— সেই ঈশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে। জীবন-সন্ধ্যাকালে প্রৌঢ়াবস্থায় মায়ার বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, তখন প্রায়ই সাংসারিক কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়। তাই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"।

আজীবন আত্মচিন্তা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, পরে জীবন-সন্ধ্যাতে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে। জীবন-মধ্যাহ্নে যেমন

জীবনের প্রখরতা ভোগ করিতে হইবে, তেমনি জীবন-সায়াহ্নে সুশীতল শান্তিসুধা ভোগ করিতে পারিবে। মধ্যাহ্নে প্রখরতা ভোগ করিলে সায়াহ্ন-কালে তাহার ফল অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে। মধ্যাহ্নে যদি তুমি প্রেয়ের অনুগত থাকিয়া বিষয়-ভোগে উন্মত্ত থাক, তাহা হইলে জীবন-সায়াহ্নে অবসাদ ও আত্মগ্লানি এবং মৃত্যুকে লাভ করিবে। প্রিয়তমাকে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে ফেলিয়া পলায়ন করিবে। অতএব সাবধান! প্রেয়ের প্রলোভনে ভুলিও না। শ্রেয়ঃ তোমার পরলোকের সঙ্গী হইয়া পরলোকে তোমাকে আনন্দ-আলয়ে লইয়া যাইবে।

প্রভাত হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দয়া ধর্ম্ম দুইটী এক-সূত্রে গ্রথিত জিনিষ; তুমি যদি দয়াকে অমূল্য রত্ন ভাবিয়া কণ্ঠে স্থান দাও, তাহা হইলে ধর্ম্মকেও লাভ করিবে। ভক্ত তুলসী দাস বলিয়া গিয়াছেন "দয়া ধরম্ কা মূল হায়, নরকমূল অভিমান, তুলসী কহে দয়া মৎ ছাড়ো যাবৎ কণ্ঠা-গত প্রাণ।" দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণ সকল যাহাতে হৃদয় হইতে চলিয়া না যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। প্রেমময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া সকলকেই প্রেম করিবে। ক্ষুদ্র, মহৎ, ধনী, দরিদ্র সকলকেই সমানচক্ষে দেখিবে। প্রেম ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া নশ্বর জীবন দ্বারা পৃথিবীর অনেক উপকার হয়। নীতি ও সদাচারসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মলাভ করা যায়। আগে নীতিশিক্ষা করিবে, তার পর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে, তার পর আত্মজ্ঞান লাভ করিবে, তবে ঈশ্বর পাইবার উপযুক্ত হইবে। এইরূপে গৃহীরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। আর সন্যাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বর বৈরাগ্যকে প্রেরণ করেন, তাঁহারা তাহারই সাহায্যে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকেন। আমি প্রকৃত ধার্ম্মিকের কথাই বলিতেছি; ভণ্ডদের কথা পৃথক্। তাহারা এবং বিষয়ান্ধ সংসারীরা একই গতি প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ সৃষ্টি করিয়া দুই জনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমান অধিকার দিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই জনের কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। যাহাকে যেরূপ কর্ত্তব্যের ভার দিয়াছেন, তাহাকে সেই সেই উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোককে দয়া মায়া কোমলতা করুণার আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়া-ছেন এবং পুরুষ মানুষকে শৌর্য্য বীর্য্য ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি, উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতিতে গঠিত করিয়াছেন। ঈশ্বর যদি তাঁহার মাতৃভাব দ্বারা রমণীকে গঠিত না করিতেন, তাহা হইলে রমণী দ্বারা পৃথিবীর উপকার হইতে পারিত না। ঈশ্বর স্ত্রীলোকের হৃদয়ে মাতৃভাব কিয়ৎ পরিমাণে দিয়াছেন বলিয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা জগতের এত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের হৃদয়ে এমন একটী গুণ আছে যে সহজে আপনাকে হারাইতে পারে। স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিলে আর কিছুরই দরকার হয়

না। রমণী যতদিন বিবাহিতা না হয়, ততদিন আপনাকে লইয়া থাকে। যখন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার কোমলতার সহিত কঠোরতা, দয়ার সহিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি, মায়ার সহিত জ্ঞানের যোজনা করেন, তখন সেই স্ত্রী পুরুষ দুইটী এক হইয়া পবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় আর অমনি আস্তে আস্তে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন আর স্ত্রীর আপনার কিছুই থাকে না, তার যা কিছু সমস্তই স্বামীর হইয়া যায়। ইহলোকের দেবতা স্বামীকে, পরলোকের দেবতা ঈশ্বরকে ভাবিয়া সে সংসারে কার্য্য করে। পবিত্র দাম্পত্যধর্ম্ম পালন স্ত্রীলোকের প্রধানতম—পবিত্রতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক্ষুধিতকে অন্নদান, তৃষিতকে জলদান, আতুরের শুশ্রূষা করা রমণীর কর্ত্তব্য। স্বামী কি সন্তানের কাহারও রোগ হইলে রমণী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তদ্গতচিত্তে তাহারই শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে এবং যতদিন আরোগ্য লাভ না ঘটে, ততদিন রোগীর সহিত রোগী হইয়া থাকে। তার পর রোগ আরোগ্য হইলে সে হৃদয়ে যে আনন্দ লাভ করে, তাহাই ঈশ্বরের প্রদত্ত পুরস্কার। যদি করুণাময় পরমেশ্বর স্ত্রীলোককে এই সকল ভাবের প্রস্রবণরূপে গঠিত না করিতেন, তাহা হইলে সংসার চলিত না। স্বামী যদি মন্দ হয়, আর স্ত্রী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে সে ভাল স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া ভাল হইয়া যায়, আর স্বামী যদি ভাল হয়, কিন্তু স্ত্রী মন্দ হয়, তবে সে স্ত্রী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া ভাল হইয়া যায়। কি গৃহী কি ঋষি সকলেই সকল কালে সকল সময়ে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন :—

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা
সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা
পতি-দেশানুবর্ত্তিনী।"

সেই স্ত্রী, যে পতিপ্রাণা, সেই স্ত্রী, যে সন্তানবতী, আর যে মন, বাক্য, ও কর্ম্মকে শুদ্ধ রাখিয়া পতির আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে।

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা
সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং
গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।"

ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়া, মনকে নির্ম্মল করিয়া প্রকৃত ভার্য্যা সখীর মত স্বামীর হিতকর্ম্মে নিযুক্তা থাকিবেন এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে গৃহকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিবেন। তাহা হইলেই ইহলোকে সুখ শান্তি ভোগ করিয়া পরলোকে সুগতি লাভ করিবে। সংক্ষেপে এই গৃহীর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুশাসনের অনুসরণ করিয়া সমুদায় জীবন অতিবাহিত করিলে নিঃসন্দেহ ঈশ্বর ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সন্ন্যাসী বাবার দল।

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন প্রথম জেম্‌স ইংলণ্ডের অধীশ্বর, তখন তিনি অশেষবিধ অন্যায় অত্যাচারে দেশবাসীদিগকে উৎপীড়িত করেন। ইহাঁরই কুদৃষ্টান্তের অনুসরণে ইহাঁর পুত্র প্রথম চার্লসের রাজ্যনাশ ও শিরশ্ছেদ হয়। রাজকোপ প্রথমে ধর্ম্মভীরু লোকদিগের উপরে পড়িয়াছিল। ইহার ফলে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বিধানে আমেরিকার সভ্যতম যুক্ত-রাজ্যের পত্তন হয়। ইহা কিরূপে হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নটিংহাম সায়ারে স্ক্রুবি নামে একটী ক্ষুদ্র নগর আছে। এই নগরে কয়েকটী শান্তপ্রকৃতি ধর্ম্মপরায়ণ লোক বাস করিতেন। তাঁহারা রাজবিধিবিহিত খৃষ্টানধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা ব্রুষ্টার (Brewster) নামে এক ভদ্র লোকের বাটীতে গোপনে মিলিত হইয়া উপাসনাদি কার্য্য করিতেন। রবিন্‌সন নামে এক জ্ঞানী ও সাধু লোক তাঁহাদের আচার্য্যপদে বৃত হন। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের গুপ্ত ধর্ম্মসাধনের সন্ধান পাইয়া বিধিমতে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। মানুষের স্বদেশ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, স্বদেশ অপেক্ষাও আবার ধর্ম্ম প্রিয়তর। এই ধর্ম্মাত্মাগণ ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে স্থির করিলেন বিদেশে গিয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মযাজন করিবেন।

এই যাত্রীর দল ভবিষ্যতে "Pilgrim fathers" বা সন্ন্যাসী বাবার দল বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। ইহাঁরা প্রথমে একখানি জাহাজে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া হলণ্ডে যাইতে উদ্যত হন, কিন্তু রাজ-সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী লুটিয়া লয় এবং বোষ্টন নগরের বাজারে তাড়াইয়া লইয়া আইসে; তথায় ইতর লোকেরা এই সাধু লোকদের উপরে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করে। ইহার পরে তাঁহারা কয়েক সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অনেক কষ্টে মুক্তিলাভ করেন।

পর বৎসর তাঁহারা পুনরায় পলায়নের চেষ্টা করেন। এবার অর্দ্ধেক লোক জাহাজে চাপিয়াছেন, আর অর্দ্ধেক লোক তীরে বোটে করিয়া আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে সৈনিক দল আসিয়া পড়িল। জাহাজের কাপ্তেন তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। তীরস্থ সঙ্গীরা ধৃত হইয়া কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। কিছু দিন পরে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারাও হলণ্ডে পলাইয়া আইসেন। আচার্য্য রবিন্‌সন হলণ্ডে তাঁহার মণ্ডলীস্থ সকল লোককে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

যাত্রিদল হলণ্ডে ১১ বৎসর কাল

অতিবাহন করেন, এবং নানাবিধ শিল্প-কার্য্যে অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া ওলন্দাজদিগের বিশ্বাস ও প্রীতিভাজন হন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের বিলক্ষণ অর্থাগমও হইতে থাকে। ব্রুষ্টার সাহেব একটী ছাপাখানা খুলিলেন এবং স্বাধীনতা বিষয়ে অনেক পুস্তক প্রচার করিতে লাগিলেন। এই পুস্তক সকল দেখিয়া ইংলণ্ডরাজ জেম্‌স বড়ই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং ইংলণ্ডবাসীদিগের উপরে অধিকতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আরও কতকগুলি ইংরাজ এই যাত্রিদলের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন।

হলণ্ডে যাত্রিদলের উপর কোন রাজ-অত্যাচার ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ধর্ম্মভাব ও স্বাধীনতা লইয়া তথায় আসিয়াছিলেন, তাহা সেই দেশবাসীদিগের সংস্রবে ম্লান হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদের ভয় হইতে লাগিল পাছে তাঁহারা ওলন্দাজজাতির সহিত মিশিয়া এক হইয়া যান। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে এক নূতন রাজ্য পত্তন করিবেন, এবং তথায় আপনাদিগের ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

১৬২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নূতন দেশে যাত্রা করিবার জন্য তাঁহারা সমুদ্রতীরে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া ভজনা আরম্ভ করিলেন। একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তাহাতে একশতের অধিক যাত্রী ধরিল না। ইহাঁদের টাকারও অভাব; অনেক লোক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, তথাপি তাঁহারা ক্রন্দন ও প্রার্থনার সহিত সহচরদিগকে বিদায় দিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "আমরাও কিছুদিন পরে তোমাদের অনুসরণ করিব।" আচার্য্য যাত্রীদিগকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিলেন "নূতন সত্যগ্রহণের জন্য তোমাদের মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিবে।"

এই যাত্রিদল আমেরিকার নূতন ইংলণ্ড প্রদেশের স্থাপনকর্ত্তা। ইহাঁরা ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দর হইতে ছাড়েন বলিয়া যে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তাহার নামও প্লাইমাউথ রাখিলেন। ইহাঁরা সজলনয়নে অনেক দিন স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম-যাজনের উপায় লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ইহাঁদিগের সরল ও কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইহারই ফল আমেরিকার বর্ত্তমান ধর্ম্ম-স্বাধীনতা—ইহারই ফল আমেরিকার বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গীণ মহোন্নতি।

কতকগুলি সুমাতা।

৫ম সংখ্যা।

কোনও চরিত্রবান্ সাধু বলিয়াছেন "ব্যাকুলতা চরিত্র-গঠনের জন্য সম্পূর্ণ অনুকূল"। সন্তানের জন্য স্নেহময়ী মাতার প্রাণ যাদৃশ ব্যাকুল, আর কাহারও জন্য কাহারও প্রাণ তাদৃশ হয় না। ব্যাকুলভাবে দীনভাবে প্রার্থনা করিলে যে দয়াময় পরমেশ্বর প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন, তাহা এই ভক্তিমতী মহিলার জীবনে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সহিষ্ণুতা নারীচরিত্রের প্রধান গুণ। ধার্ম্মিকা জননী প্রার্থনা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা দুর্দান্ত পাপী সন্তানের জীবনে কিরূপ মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করেন, সুমাতার শাসন ও শিক্ষা কিরূপে সন্তানকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করে, এই মহিলা তাহার সম্পূর্ণ নিদর্শন।

মহানুভব সেণ্ট অগষ্টিনের জননী মণিকা দেবী ৩৩২ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকাখণ্ডের এক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জনক জননী ধর্ম্মপরায়ণ ভদ্রবংশজাত ধনী লোক ছিলেন। তাঁহাদের উপদেশ ও সাধু দৃষ্টান্তে অতি শৈশবাবস্থাতেই মণিকার অন্তরে সাধুতার বীজ নিহিত হইয়াছিল। মণিকা দেবী কোনও অন্যায়াচরণ করিলে তাঁহারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ শাসন করিতেন এবং সকল কার্য্যেই কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের আবশ্যকতা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। মণিকা সাধু পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্তে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াই ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মতৃষ্ণা দ্বারা সতেজ চিত্তবৃত্তি ও বলবতী সুখস্পৃহাকে আয়ত্ত ও সংযত করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। তগস্তানগরবাসী জনৈক যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পতির চরিত্র বড়ই কদর্য্য ছিল। কিন্তু মণিকা দেবী বিবাহের পরেই তাঁহার গৃহে আগমন করিয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সপ্রেম ব্যবহার ও সুমিষ্ট বচনের দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিতে ও সুপথে আনিতে প্রয়াস পাইতেন। তিনি ভ্রমেও স্বামীর অসচ্চরিত্রতা ও দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন "বিপথগামী ব্যক্তিকে সুপথে রক্ষা করিতে হইলে প্রেম ও প্রার্থনাই একমাত্র মহৌষধি।" তিনি মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যেও তদনুরূপ করিতে যত্ন করিতেন। তাঁহার প্রসন্ন পবিত্র মুখে সাধুতা, বিনয় ও গভীর-ধর্ম্মনিষ্ঠার জ্যোতিঃ সর্ব্বদা ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহার সচ্চরিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পতির আত্মীয় বন্ধুগণ এবং তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার পতি মৃত্যুর কয়েক বৎসর

পূর্ব্বে সমুদায় দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

মণিকা দেবী যথাসময়ে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেন্ট অগষ্টিন বিদ্যা বুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মণিকা ও তাঁহার স্বামী তাঁহাদের প্রতিভা-শালী পুত্রকে তৎকালপ্রচলিত ন্যায় ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী করণার্থে কার্থেজ নগরে প্রেরণ করিলেন। অগষ্টিন কার্থেজে গিয়া অভিভাবকশূন্য ও নাস্তিকমতাবলম্বী হইয়া যৌবনকালেই ঘোর পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইল।

বিধবা পবিত্রপ্রাণা জননী মণিকা পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনাগ্রস্ত হইলেন। তিনি যৌবনমদে মত্ত পুত্রের হস্ত ধরিয়া কান্দিয়া কতই বুঝাইলেন, তিনি কি ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বুঝাইতে অনেক প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু হায়! সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। ধার্ম্মিকা জননীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, সমস্ত বাক্য ও মর্ম্মভেদী অশ্রুজল অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া গেল।

তখন মণিকা মাতা নিরুপায় হইয়া একেবারে দয়াময়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করাই শ্রেষ্ঠ উপায় জানিয়া ঐ উপায়ই গ্রহণ করিলেন। হায়! সে ছবিটী মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। পবিত্রপ্রাণা সাধ্বী জননী একমনে জানু পাতিয়া বক্ষঃস্থলে অঞ্জলি বদ্ধ ও নয়ন মুদ্রিত করিয়া পুত্রের সুমতির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রু কণাগুলি গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বক্ষে পতিত হইতেছে; পলক নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, দৃক্‌পাত নাই, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ভজনান্তে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল, মণিকা আচার্য্যকে বলিলেন "দুঃখিনীর প্রতি কৃপা করুন, আমার প্রিয়তম পুত্রের জন্য প্রার্থনা করুন।" আচার্য্য ২।৪ দিন শুনিলেন, নিত্য ঐ এক কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বাছা! গৃহে যাও, যে পুত্রের জন্য এত অশ্রুজল পতিত হইতেছে, সে পুত্র কি কখন একেবারে নষ্ট হইবে?" তিনি আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে অগষ্টিনের কার্থেজ নগরের শিক্ষা একরূপ সমাপ্ত হইল। তখন তিনি সুপ্রসিদ্ধ রোমনগরে গিয়া কোনও প্রকার অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার বাসনা করিলেন। রোম মহানগর, তথায় বিপথ-গামী যুবকদিগের জন্য সকল প্রলোভন-দ্বার উন্মুক্ত, সুতরাং রোমের নাম শুনিয়াই মণিকার মস্তকে বজ্রপাত হইল; তিনি কম্পিতহৃদয়ে পুত্রকে বারম্বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু অগষ্টিন মাতৃবাক্য শুনিবার লোক ছিলেন না। তাঁর সঙ্কল্প স্থিরতর রাখিলেন। সুতরাং মণিকা দেবী তাঁহার সহিত যাইবার ইচ্ছা করিলেন। অগষ্টিন কি করেন, মৌখিক সম্মত হইয়া মাতাকে সঙ্গে লইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সমুদ্রের উপকূলে নিদ্রিতা মাতাকে ফেলিয়া রাখিয়া

পোতারোহণে চলিয়া গেলেন। নিদ্রা-ভঙ্গে জননী পুত্রের কার্য্য অবগত হইয়া যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ অনেক কষ্টে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

গ্রীষ্মকালের ভয়ানক উত্তাপে মানবগণ যখন অস্থির হইয়া পড়ে, সেই সময়েই সুবৃষ্টি হইয়া তাপিত জীবকুলের প্রাণ সুশীতল করিয়া দেয়। "দুঃখের পর সুখ" একটী প্রবাদবাক্য। শরীরসম্বন্ধে যেমন, মানসিক বিষয়েও তদ্রূপ। বিশ্বস্রষ্টার অপার করুণা—অনন্ত দয়া। তাঁহার উপর নির্ভর-হীনতা ও বিশ্বাসহীনতা প্রযুক্তই আমরা সময় সময় নিরাশ হইয়া পাড়ি ও কষ্ট পাইয়া থাকি। মণিকা দেবীর দুঃখের "বোঝা" এত গুরুতর হইয়া উঠিল যে, তার উপর আর "ভার" চাপাইলে তিনি একেবারেই মারা পড়িবেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রথমে স্বামী, এবং তৎপরে পুত্র হইতে দুঃখ ও অশান্তিই উৎপন্ন হইয়াছিল। দুঃখিনী মণিকা এ পর্য্যন্ত সন্তান হইতে সুখ অনুভব করেন নাই। এইবার দয়াময় তাঁহার কঠোর তপস্যায় পরিতৃপ্ত হইলেন। এইবার মণিকার মেঘাচ্ছন্ন অদৃষ্ট পরিষ্কার হইবার উপক্রম হইল। ভগবান্ সুকঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াই যেন এইবার তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন।

এদিকে কতকদূর গিয়া দুর্দ্দান্ত অগষ্টিন প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতে লাগিল। নিজের দুর্ব্যবহারের বিষয় স্মরণ হওয়াতে অনুতাপে তাহার হৃদয়ে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। এক দিকে স্নেহময়ী মাতার সদ্ব্যবহার, পবিত্র স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ প্রেম ও উদারতার সহিত সেবা যত্ন ইত্যাদি, অন্য দিকে নিজের দুর্ব্যবহার, অপবিত্র চরিত্র, অপ্রেম ও অনুদারতা ভাবিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকাল, নীচে অগাধসমুদ্রের সুনীল বারিরাশি মৃদু মন্দ সমীরণ দ্বারা বিক্ষোভিত ও তরঙ্গা-য়িত হইতেছে, তদুপরি নীলাকাশের প্রতিবিম্ব সান্ধ্য কিরণরাশির সহিত পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। পাপরোগগ্রস্ত অগষ্টিন এই সময় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত করুণায় দুরন্ত অগষ্টিনের পাপজীবন এইখানেই বিনষ্ট হইয়া নবজীবনের সূত্রপাত হইল। মণিকা সতীর অশ্রুজলে প্রার্থনার বীজ এইবার অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল।

কিছুক্ষণ এইরূপ অনুতাপের তীব্র দংশন ভোগ করিবার পর অগষ্টিনের চৈতন্য হইল। সুমাতার অশ্রুসিক্ত নয়ন ও কাতর হৃদয়-ভেদী বাক্যগুলি স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র অগষ্টিন গৃহে ফিরিয়া যাইতে মনঃস্থ করিলেন এবং ক্ষুদ্র তরী আরোহণে তাগস্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন দিন পরে মণিকা জননী কুপথগামী পুত্রকে তীব্র অনুতাপের সহিত প্রত্যাগত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। ধৈর্য্যশীলা পবিত্র জননীর প্রার্থনা এতদিনে পূর্ণ হইল। যে অগষ্টিন

পাপস্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি এখন ধর্ম্মযাজক পদ গ্রহণ করতঃ জলন্ত আত্মোৎসর্গ, গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য "সেণ্ট" (ঋষি) উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

হেঁয়ালি।

সরস্বতী-দ্বারে বসি ত্রিভঙ্গ মুরারি,
শ্যামল সুঠাম, মুখে মোহন বাঁশরী।
তাঁরে ছাড়ি কে লভিবে ধন মান জ্ঞান?
হেরি রূপ কাঁপে কিন্তু শিশুর পরাণ।
যত্নে শিশু বশ তাঁরে কর একবার,
খগ বাহনেতে জয় করিবে সংসার।
দ্বার খুলি বিদ্যাদেবী আদরে লইবে,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অচিরে হইবে।

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন নগরের ছোট বড় যাবতীয় ব্যবসাদারের প্রাত্যহিক বিজ্ঞাপনের ব্যয় প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

২। নিউইয়র্কে চুল কাটিবার এক নূতন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ যন্ত্রের এক অংশ চিরুণীর ন্যায় এবং উহার দন্তগুলি প্লাটিনম্ ধাতু দ্বারা আবৃত। যন্ত্রস্থিত তাড়িতপ্রভাবে এই চিরুণী চুলের উপর দিয়া টানিয়া যাইলে, চুলগুলি অতি পরিষ্কৃত ও সমানভাবে কাটিয়া যায়।

৩। মহীশূরের মহারাণী স্বরাজ্যের বয়স্কা বিধবাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয়ের তিনটী অতিরিক্ত শ্রেণী খুলিবার আদেশ দিয়াছেন। বিধবাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা পাইবার সুযোগের জন্য যথোপযুক্ত মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রী-পদে ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে।

৪। বিজ্ঞান-জগতের মহারথী অধ্যাপক হক্সলির মৃত্যু হইয়াছে। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি অনেক অভিনব আবিষ্কার এবং পদার্থ-বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

৫। ফ্রান্সের উত্তরাংশে থেন্‌লেস নামক স্থানে মার্শেরাইট রোনিনডি নাম্নী এক বালিকা বিগত ১১বৎসর মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও জাগরিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়

এই যে, এই বালিকার শারীরিক প্রক্রিয়ার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। নিদ্রিত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে সে চীৎকার করিয়া থাকে; ইহা ব্যতীত সে যে জীবিত, সহজে বিশ্বাস করা কঠিন।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

(১) বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২৷৷০ টাকা।

(২) উপনিষদঃ, ২য় খণ্ড,—শ্রীসীতানাথ দত্ত সম্পাদিত, মূল্য ১৲ টাকা।

(৩) প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্র নাথ সিংহ প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা।

স্থানাভাবে এবারও কোন সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।

বামারচনা।

বর্ষা-বালা।

কি সাজে সেজেছ আজ,
আ মরি বরষা সতি!
কোথা লাগে এর কাছে,
শরৎ-বসন্ত-জ্যোতি। ১

গলায় বিজলীহার
আহা কি সুন্দর সাজে,
মেঘ-গরজন-ছলে
চরণে নূপুর বাজে। ২

আকাশেতে ছুটাছুটি
করিতেছে মেঘদল;
ধরণী কর্দ্দমময়
ঝম্‌ঝম্ পড়ে জল। ৩

গাছের পাতায় পড়ে
টুপ টাপ বারিবিন্দু,
তব মুখ দেখি সুখে
উথলি উঠিছে সিন্ধু। ৪

ময়ূর পেখম তুলে
তোমার মহিমা গায়,
তোমার ও-সোণা-মুখ
কার না হৃদয়ে ভায়? ৫

যুঝিছে তারকা সাথে
জলদ গরবভরে,
সে যেন আকাশে ঠাঁই
দিবে না একটু তারে। ৬

প্রকৃতি শ্যামল বাসে
চারু মুখ ঢাকিয়াছে,
হেরি সে মধুর দৃশ্য
সুখে প্রাণ বিগলিছে। ৭

তোর ও-মূরতি মোরে
করেছে পাগল-পারা,
দেখেছি অনেক রূপ,
দেখিনি এমনধারা। ৮

পরাণ-মাতান রূপ
তোর লো বরষা-বালা,
তোর রূপ-ভাতি মোর
হৃদয় করেছে আলা। ৯

তোর ও-রূপের স্রোতে
  ডুবে গেল ধরাখান।
কি আশ্চর্য্য ডুবে যাবে
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ! ১০

তোর ও-মূরতিখানি
  আলোক আঁধারে মেশা,
যত দেখি তত মোর
  বাড়ে দরশন-তৃষা। ১১

শরৎ বসন্ত শীত
  তোর কণা তুল্য হয়,
তোর বুকে অবিরত
  প্রেমের তুফান বয়। ১২

তোর প্রেমে ডুবে গেল,
  রবি শশী তারারাশি,
তাইত বরষা আমি,
  তোরে এত ভালবাসি। ১৩

বাসন্তী উষায় ডুবে
  যাক্ যে ডুবিতে চায়।
আমার হৃদয় ভুলে,
  বারেক চাহে না তায়। ১৪

চাহি না ডুবিতে আমি
  শারদ জোছনা-করে,
ডুবিবে না হিয়া মোর
  বীণার ললিত স্বরে। ১৫

ডুবাতে নারিবে মোরে
  বসন্ত-কোকিল-তান,
বরষার নীলিমায়
  ডুবে রবে মোর প্রাণ। ১৬

বরষা লো তোর ওই
  সোণা-মুখে মধু হাসি,
আমি বড় ভালবাসি
  তোরি মাঝে রব মিশি। ১৭

তোর আগমনে আজ,
  অসীমে সসীম সনে,
দেখি হেন মিশামিশি,
  কারে যেন পড়ে মনে। ১৮

সে যেন নয়নে জাগে,
  মোর মনে পড়ে যারে,
করি কত অন্বেষণ,
  অথচ না পাই তাঁরে। ১৯

বোধ হয় তোর মাঝে
  ডুবিলে তাঁহারে পাব,
তোরি মাঝে ডুবে আমি
  তাঁহারে খুঁজিয়া লব। ২০

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

আষাঢ়ের হেঁয়ালির উত্তর।

"হ"এতে আকার আর "ব"এ শূন্য র,
এই হেঁয়ালির এই প্রকৃত উত্তর।
তিন বার পড়িয়াই বুঝিলাম সার,
আষাঢ়ের হেঁয়ালিটী শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আহার, প্রহার, উপহার ও সংহার,
এই সব উপসর্গে হেঁয়ালি বাহার।

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৮ সংখ্যা।	ভাদ্র ১৩০২—সেপ্টেম্বর ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর ত্রয়স্ত্রিংশ জন্মোৎসব।

এস ভাই বোন্ সবে,
শুভ জনম-উৎসবে,
আজি শুভদিন শুভক্ষণ,
প্রীতির কুসুম-হার,
ভক্তিভরে উপহার
দিয়া পূজি বিভুর চরণ।
জীবন সঞ্চার হ'তে,
সেই বিধি বিধিমতে,
করিছেন রক্ষণ পালন;
উন্নতি সুখ কল্যাণ,
সকলি তাঁহার দান,
অজস্র অজস্র অগণন।
তাঁহারই চরণাশ্রয়ে,
ক্ষুদ্র কলেবর লয়ে,
জনমিয়া এ বামা-বোধিনী;
অবলা-হিতের তরে,
সামান্য যতন ক'রে,
কত সুখে হ'য়েছে সুখিনী!
আজি বঙ্গে ঘরে ঘরে,
পুস্তক নারীর করে,
গ্রামে গ্রামে নারী-শিক্ষালয়;
নারী—
বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি,
উপাধি-ভূষণে সাজি,
গৌরবে পুরুষে করে জয়।
আজি নারী দেয় শিক্ষা,
উপদেশ ধর্ম্ম দীক্ষা,
পত্রী গ্রন্থ করে বিরচন;

দেশের হিতের-তরে,
জীবন উৎসর্গ করে,
আত্মসুখ করি বিসর্জ্জন।
হয় নাই কভু যাহা,
হতেছে এখন তাহা,
আরো কি হইবে কেবা জানে?
ধন্য দেব দয়াময়,
তোমার কৃপার জয়
ত্রিজগৎ সতত বাখানে।
দুখিনী তোমার মেয়ে,
আছে এই দেশ ছেয়ে,
আজও কত সহিছে পীড়ন,
কুসংস্কার, দেশাচার,
কতবিধ পাপাচার,
নারী-প্রাণ করিছে দাহন।
কৃপাময়!
কর প্রভু কৃপা কর,
তাদের দুর্গতি হর,
যাচি ভিক্ষা আজি নত-শিরে;
নারীর উন্নতি-ফলে,
স্বর্গরাজ্য ধরাতলে,
অবতীর্ণ হউক অচিরে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন পার্লেমেণ্ট—গত ১৫ই আগষ্ট নূতন পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। দাদা ভাই নৌরজী এবার মনোনীত হইতে পারেন নাই। ভারতবাসীর মধ্যে মেঃ ভাউনগিরী নূতন সভ্য হইয়াছেন। দাদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তিনিও ভারতের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হউন।

মহারাণীর বক্তৃতা—নূতন পার্লেমেণ্ট রাজকীয় কমিসন দ্বারা খোলা হয় এবং লর্ড চান্সেলর মহারাণীর বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার সার মর্ম্ম এই :—

সকল বিদেশীয় রাজ্যের সহিত সদ্ভাবের সমাচার পাইয়াছি। ইউরোপের শান্তি-ভঙ্গের কোনও কারণ নাই। জাপান ও চীনের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে আশা করা যায়। ফুকিয়েন প্রদেশে ইংরাজ মিসনরী হত্যার জন্য পরিতাপ করিতেছি; আশা করি চীন-গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, অপরাধীদিগের উপযুক্ত দণ্ডবিধান হইবে। আর্ম্মেনিয়ার প্রতি অত্যাচারে সমুদায় খৃষ্টানজাতি এবং বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশীয় রাজদূতেরা যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, সুলতান তৎসম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা করেন দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছি।

জাপানের প্রাচীনত্ব—জাপান একটী প্রাচীন রাজ্য, ইহার ২৫০০ বৎসরের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

বেথুন স্মৃতি-সম্মিলন—ভারত-হিতৈষী

মহাত্মা বেথুনের স্মরণার্থ তাঁহার স্বর্গারোহণ-দিন ১২ই আগষ্ট প্রায় ৪০।৫০ টী মহিলা ও কতকগুলি ভদ্রলোক তাঁহার সমাধিস্থলে গিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান স্থায়ী হওয়া প্রার্থনীয়।

চীনে অরাজকতা—চীনেরা কুচিও-নামক স্থানে কতকগুলি ইংরাজ ধর্ম্ম-প্রচারককে হত্যা করিয়াছে। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট এ দুষ্কর্ম্মের সমুচিত দণ্ডবিধানার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

শাশুড়ীর সৌভাগ্য—জানজিবারের জামাই শ্বশুরের গ্রামে গিয়া বাস করে এবং বিনা বেতনে শাশুড়ীর গোলামী করে।

ড্রেণেজ আইন—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জলনিকাশের এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ইহার পক্ষ এবং দেশের প্রতিনিধিরা বিপক্ষ ছিলেন। নূতন ট্যাক্স বসিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা দ্বারা দেশের যথার্থ হিত হইবে কিনা, সন্দেহ।

বৌদ্ধ টেক্‌ষ্ট-বুক সভা—ভারত-বিজ্ঞান-সভাগৃহে ইহার এক অধিবেশন হয়। পূর্ব্ব-উপদ্বীপ-প্রচলিত এক নূতন রামায়ণের ছবি তাহাতে প্রদর্শিত হয়—ইহাতে রামের নাম গন্ধ নাই, রাবণ অসুর ভারত-রাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করেন। কাম্বোডিয়ার এক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ণিত হয়, ইহা অর্দ্ধ ক্রোশ যুড়িয়া আছে, মন্দিরটীতে ৬৪০০০ স্তম্ভ ছিল। ইহা ভারতবাসীদিগের দ্বারা নির্ম্মিত।

মুকুল—এই নামে একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ইহা বালক বালিকাদিগের উপযোগী। ইহাতে অনেক সুন্দর ছবি ও গল্প আছে।

মহতের মৃত্যু—অধ্যাপক হক্সলি সম্প্রতি পরলোক-গত হইয়াছেন। ইনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মুখপাত্র ছিলেন।

গোবিন্দের গৃহত্যাগ।

(১)

ছুরী, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহময় অস্ত্র শস্ত্রের গঠন জন্য বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত যে কাঞ্চন নগর ভারতের সর্ব্বত্র খ্যাত, ৩৮৭ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ শকাব্দার পঞ্চদশ শতাব্দীতে তথায় এক কর্ম্মকার বাস করিত। অদ্যাপি সেখানে অনেক কর্ম্মকার বাস করিয়া ছুরী, কাঁচি গঠন ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমরা যে কর্ম্মকার গৃহস্থের বিবরণ বলিতেছি, এখনকার কোনও গৃহস্থ তদ্‌বংশীয় কি না, বলা যায় না। ঐ গৃহস্থের

নাম শ্যামাদাস ও তাহার পত্নীর নাম মাধবী, পুত্রের নাম গোবিন্দ, পুত্রবধূর নাম শশিমুখী।

বঙ্গদেশীয় স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পী জাতিগণ স্বভাবতঃ অমিতব্যয়ী। তাহাদিগের উপার্জ্জন নিতান্ত অল্প হয় না; কিন্তু ঐ অমিতব্যয়িতা-দোষে তাহাদিগের সংসারে লক্ষ্মী দাঁড়াইতে পারেন না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, ঐ জাতীয় ব্যক্তিগণের দৈনিক আহারাদির পারিপাট্য বড় বেশি, ঘৃত, দুগ্ধ, বড় মৎস্য, ছাগমাংস, ভাল তামাক, ২।১ বোতল ধান্যেশ্বরী নহিলে তাহাদিগের চলে না। ধান্যেশ্বরীর ব্যবহারটা স্বর্ণকার ব্যতীত অন্যের ঘরে বড় দেখা যায় না। ঘরে চাউল, দাউল, তৈল, লবণ ইত্যাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আছে কি, না আছে, তাহার সন্ধান না লইয়া উক্তজাতীয় ব্যক্তিগণ অনায়াসে বড় মৎস্য বা ছাগমাংস ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। গৃহিণীগণ স্বামিগণের এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে প্রথমতঃ এক পালা কলহ করিয়া, পরে কাঠা হাতে করিয়া অন্যের বাড়ী চাউল ধার করিতে বাহির হয়। যে সূত্রধরের ঘরে এক মুষ্টি চাউল নাই, সে একদিনের সমস্ত উপার্জ্জন মৎস্যে বা মাংসে ব্যয় করিয়াছে, এরূপ ঘটনা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পুরুষগণের এইরূপ আচরণ নিয়ত দর্শন করিয়া, ক্রমশঃ স্ত্রীগণও ঐ ভাবে শিক্ষিতা হইয়া পড়ে। এই জন্য,—

"ছুতারের তিন স্ত্রী, ভানে কোটে খায়,
থাকে থাকে, যায় যায়।"

এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার অনেক ছুতার লেখা পড়া শিখিয়া "ভদ্র" লোক হইয়াছেন, তাঁহারা যেন এ প্রবন্ধ পাঠে অসন্তুষ্ট না হন। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছুতারের কথা বলিতেছি। যাহা হউক, ঐরূপ কোন কারণে, একদা গোবিন্দের সহিত তাঁহার স্ত্রীর কলহ উপস্থিত হয়। গোবিন্দ ভবিষ্যৎ জীবনে এই কলহের কিরূপ ফল পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

(২)

যখন বল্লালবংশীয় শেষ ভূপতি নবদ্বীপাধিপ লাক্ষণেয় বখ্‌তিয়ার খিলিজির আক্রমণভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, রাজপুরী বিধ্বস্ত হইয়া ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু নৈসর্গিক জলনিখাত ভাগীরথী ও খড়িয়া তখনও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তিনী হয়েন নাই, পলায়ন-পর নরপতি যে স্থানে জলযানে আরোহণ করেন, ভাগীরথী সেই স্থানেই বিরাজ করিতেছিলেন; জাহ্নবী ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থল যখন শ্রীধাম নবদ্বীপের (অধুনা মায়াপুর) পাদপ্রক্ষালন-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গোক্রম দ্বীপের (স্বরূপগঞ্জ) দক্ষিণবর্ত্তী হন নাই; যখন রঘুনাথ, রঘুনন্দন, গঙ্গাদাস, বাসুদেব, কৃষ্ণানন্দ, দেবানন্দ প্রভৃতি দার্শনিক, স্মার্ত্ত, তান্ত্রিক, ভাগবত অধ্যাপকগণ

নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; যখন নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান করিত; যখন নবদ্বীপ, কাশী, মিথিলা, পুনার ন্যায় ভারতবর্ষে সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল; যখন নিমাই পণ্ডিতের শত শত ছাত্র সকল শাস্ত্রের কৃষ্ণব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রন্থে ডোর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন (১৪৩০ সালের) এক দিন পূর্ব্বাহ্ণে একটী পুরুষ নবদ্বীপের মিশ্রঘাটে উপবিষ্ট হইয়া বিষণ্ণবদনে চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখ হইতে একটী বাক্য পরিস্ফুট হইলঃ—

"আমি যাঁহাকে দর্শন করিবার উদ্দেশে কাটোয়া হইতে ছুটিয়া আসিলাম, তাঁহাকে দেখিতে পাইব কি?" এই কথা বলিয়াই যেমন বদন উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি দেখিতে পাইলেন,—

"কটিতে গামোছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন।
সঙ্গে এক অবধৌত প্রফুল্লবদন॥
তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে।
স্নানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে॥
অবধৌত বীর পাড় হইতে ঝাঁপ দিলা।
সাঁতারিয়া জলকেলি করিতে লাগিলা॥
শ্রীরাম ঠাকুর পিছু পিছু দামোদর।
সিদ্ধ হরিদাস আর বামে গদাধর॥
অবশেষে আইলা তথা অদ্বৈত গোসাই।
এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই॥
পক্ককেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ি পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥
হরিধ্বনি সহ বুড়া করয়ে চীৎকার।
অবধৌত সাঁতারিয়া করে পারাপার॥
একে একে গঙ্গাগর্ভে সবে ঝাঁপ দিলা।
সন্তরিয়া সবে নানা কেলি আরম্ভিলা॥
আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিনু।
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু॥
স্নান করি গোরাচাঁদ উঠিলা ডাঙ্গায়।
কুটিল কুন্তলরাশি পৃষ্ঠেতে লোটায়॥
শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ।
নীলপদ্মদল সম সুদীর্ঘ নয়ন॥
সুন্দর কপোলযুগ প্রশস্ত ললাট।
সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট॥
রাম-রম্ভা জিনি শোভে মনোহর উরু।
তুলি দিয়ে আঁকা যেন ছুটী চারু ভুরু॥
আলতা-রঞ্জিত যেন যুগল চরণ।
নিরখিলে মুগ্ধ হয় মুনির নয়ন॥
প্রেমময় তনুখানি মুখে হরিবোল।
যারে পান দয়া ক'রে তারে দেন কোল॥
হরি বলি অশ্রুপাত করে মোর গোরা।
পিচ্‌কারী ধারা সম বহে অশ্রুধারা॥
চলিতে লাগিলা তবে মোর গোরা রায়।
অবধৌত নিত্যানন্দ পিছু পিছু ধায়॥" (১)

এই সময়ে ঐ পুরুষের সহিত কোন ধীবরের সাক্ষাৎ হইল। পুরুষ ধীবরের নিকট উল্লিখিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের পরিচয় লইলেন। পরিচয় পাইবামাত্র তাঁহার কলেবর কদম্বকুসুমের ন্যায় কণ্টকিত হইল, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইল। তাঁহার মনে যে কত অপূর্ব্ব ভাবের

(১) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচা।

উদয়াস্ত হইয়া গেল, তাহা কে গণনা করিতে পারে? এই সময়ে হঠাৎ নিমাই পণ্ডিত সদলে তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। পুরুষ ছুটিয়া গিয়া তাহার চরণে পতিত হইলেন এবং নয়নজলে চরণযুগল ধৌত করিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। পুরুষ চরণোপান্তে করযোড়ে জানুপরি উপবিষ্ট হইয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। তখন নিমাই পণ্ডিত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন,—

"এত কৃপা কেন মোরে ওহে দয়াময়।
অধমের নাম গোবিন্দ দাস হয়।
ছিলাম গৃহস্থগৃহে নানা কর্ম্ম করি।
এবে কিন্তু হইয়াছি পথের ভিখারী॥
বিষয় ছাড়িয়া এনু প্রভু-দরশনে।
এবে স্থান দেও প্রভু ও রাঙা চরণে॥
বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে মোর ধাম।
শ্যামাদাস কর্ম্মকার জনকের নাম।

এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট পুরুষের মুখে এই পরিচয় পাইলেন যে, আমরা প্রবন্ধের শিরোভাগে স্ত্রীর সহিত কলহকারী যে গোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছি, এই পুরুষটী সেই গোবিন্দ। গোবিন্দ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ গৃহবিচ্ছেদের ছলে আমাকে নবদ্বীপ আনিয়াছেন।

(৩)

ভিক্ষা দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া দিন যাপন করিব, এ পাপ সংসারে আর রহিব না, স্ত্রীর সহিত কলহান্তে গোবিন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া কাঞ্চন নগর ত্যাগ করেন। গোবিন্দ গৃহত্যাগের এইরূপ হেতুবাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়।
এক দিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়॥
নির্গুণে মূরখ বলি গালি দিলা মোরে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে॥"

গোবিন্দ গৃহ ছাড়িয়া প্রথমে কাটোয়ায় উত্তীর্ণ হন। তথায় শ্রীচৈতন্য দেবের রূপ-গুণলীলাদির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা এতই বলবতী হয় যে, অনাহারে অনিদ্রায় সমস্ত দিবারাত্র মাঠে মাঠে ছুটিয়া পর দিন প্রভাতকালে নদীয়ার ঘাটে উপস্থিত হন। তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা ভগবান্ কিরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

চৈতন্য প্রভু গোবিন্দ দাসের পরিচয় পাইয়া কহিলেন,—"গোবিন্দ, তুমি আমার সংসারে থাকিয়া প্রতিদিন গঙ্গাজল, তুলসী আনিয়া বিষ্ণুপূজার সজ্জা করিবে, নিত্য হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে এবং উদর ভরিয়া প্রসাদ পাইবে।" গোবিন্দ, প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণে কৃতার্থ হইলেন। বিশেষতঃ তৃতীয় আদেশটীতে আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কারণ গোবিন্দ দাস একটু উদর-পরায়ণ ছিলেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার যে কলহের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যে গোবিন্দের উদরপরায়ণতা-ঘটিত, তাহাতে কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। গোবিন্দ নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন,—

"শাক সূপ দধি দুগ্ধ মোদক পায়স।
বড়া লাড়ু পিষ্টকাদি খাইতে সুরস॥
প্রতি দিন শচী মাতা করেন রন্ধন।
আনন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন॥
পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস।
দয়াল প্রভুর পাত্রে খাই বার মাস॥"

গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর যে তিনটী আদেশ হয়, তন্মধ্যে গোবিন্দের স্বহস্ত-লিখিত করচায় তৃতীয় আদেশ পালন, অর্থাৎ ষোড়োশোপচারে মহাপ্রসাদ সেবনেরই প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু তিনি প্রভু-চরিতের অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। এক স্থলে লিখিয়াছেন, মহাপ্রভু,—

"কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥
যদি কেহ "রাধে" বলি উচ্চ শব্দ করে।
অমনি অশ্রুর ধারা ঝর ঝর ঝরে॥
'প্রাণকৃষ্ণ' বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥"

এইরূপে গোবিন্দ মহাপ্রভুর সংসারে থাকিয়া তাঁহার রূপগুণ আস্বাদন, তাঁহার দলবলের সহিত শ্রবণকীর্ত্তন এবং প্রসাদ ভোজনাদি দ্বারা পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একটী মহাঝটিকা উত্থিত হইয়া তাঁহার জীবন-তরঙ্গিণীতে মহাতরঙ্গের সৃষ্টি করিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। কি ঘরে, কি বাহিরে, কি ভক্তমণ্ডলীতে, কি পণ্ডিতসমাজে, হাহাকার ধ্বনি উঠিল। যেমন পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নদীর জলপ্রপাত হইলে তাহার বেগ রোধ করা অসম্ভব, তেমনি পুরুষ-সিংহ শ্রীচৈতন্যের এই বাসনা-স্রোতে বাধা দেয় কাহার সাধ্য? প্রভু জননী, রমণী, আত্মীয়, স্বজন, শিষ্য, বন্ধু, সকলের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া কাটোয়ায় গমনপূর্ব্বক কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। শিখা সূত্র পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। তাঁহার কুটিল কুন্তলাবৃত মস্তকের মুণ্ডন দেখিয়া মনুষ্যের কথা দূরে থাক, পশু পক্ষীও 'ঝুরিয়াছিল,' পাষাণও গলিয়াছিল। গোবিন্দের পরম সৌভাগ্য এই যে, প্রভু তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরাবর সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।

(৪)

যে দিন সন্ধ্যাকালে কণ্টক নগরের গঙ্গাতীরে ভারতী গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হইলেন, সেই দিন কেশব ভারতী তাঁহাকে কহিলেন,—

"লোক শিক্ষা লাগি তুমি পরিলে কৌপীন।
ভক্তিমার্গ দেখাইতে দীনের অধীন॥
অপরাহ্নকালে প্রভু সন্ন্যাসী হইলা।
হুলুধ্বনি নারীগণ করিয়া উঠিলা॥
লতা পাতা শাখা বৃক্ষ প্রেমেতে ভাসিল।
পশু পক্ষী কীট যেন নাচিয়া উঠিল॥
লক্ষ লক্ষ লোকে করে পুষ্প বরিষণ।
কণ্টক নগর হ'লো নন্দনকানন॥

* * *

অঞ্জলি পূরিয়া যত কুলবধূগণ।

প্রভুর মাথায় করে লাজ বরিষণ॥
হরিধ্বনি উঠিলেক গগন ভেদিয়া।
গড়াগড়ি যায় সবে ভক্তিতে রসিয়া॥
আকাশ ভেদিয়া নাম ভাসিছে গগনে।
আনন্দে মাতিয়া শুনে যত দেবগণে॥"

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে একটী নবীন সন্ন্যাসী উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত কৌপীন-বহির্ব্বাসধারী আর একটী বৈষ্ণব ছিলেন। এই বৈষ্ণবটীকে তখন নিতান্ত কাতর-ভাবাপন্ন ও উন্মনা বোধ হইতেছিল। সন্ন্যাসী সঙ্গী বৈষ্ণবের এইরূপ ভাব দর্শনে তাঁহারপৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন "চল তোমাদের গৃহে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করি।" এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব চমকিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন,—

"তোমার সন্ন্যাসকালে ধরেছি কৌপীন।
অহঙ্কার ত্যজিয়া হয়েছি অতি দীন॥
আর ত যাব না প্রভু আপনার ঘরে।
বিষ্ঠাসম ত্যজিয়াছি জঘন্য সংসারে॥"

সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে একটী সুন্দরী নারী উচ্চরবে রোদন করিতে করিতে বৈষ্ণবের চরণে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িলেন এবং অশ্রুপ্লাবিত-লোচনে কহিলেন,—

"সামান্য কথায় তুমি সংসার ত্যজিলে।
দাসীর উপায় তবে বল কি করিলে॥
কার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিব কোথায়।
দয়া করি কেবা ভিক্ষা দিবে গো আমায়॥"

হরিচরণ স্মরণে সকল বন্ধন কাটিয়া যায় ভাবিয়া বৈষ্ণব কেবল দীনভাবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। নবীন সন্ন্যাসী ঠাকুর এই ব্যাপারদর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"গোবিন্দ, এই রমণীটী তোমার কে?" গোবিন্দ কহিলেন, "আমার পূর্ব্বাশ্রমের ধর্ম্মপত্নী,—শশিমুখী" —শশিমুখী প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দের নারী শুনিয়া শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে দয়া হইল। তিনি তাহাকে অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, তত্ত্বকথা কহিয়া বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী", শশিমুখী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে এবং গোবিন্দকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন প্রভু গোবিন্দকে কহিলেন, "গোবিন্দ,তুমি গৃহে গমন করিয়া কিছু কাল সংসারধর্ম্ম কর, আমি অন্য ভৃত্য লইয়া পুরী প্রস্থান করি।" এই সময়ে গোবিন্দের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আসিয়াও তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিলেন। কিন্তু স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ একবার সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে পুনরায় কি লৌহ হইতে পারে? গোবিন্দ প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অভয় ভিক্ষা করিলেন। ভবরোগীর জীবনে সৎসঙ্গরূপ মহৌষধের ফল ধরিয়াছে দেখিয়া প্রভু গোবিন্দকে অভয় দিলেন। গোবিন্দ তখন স্বজনগণকে কহিলেন,—

"শুন শুন ওহে ভাই রমণীর বাণী।
রমণী রমণ হয় এরূই পরাণী॥

* * *

অমৃত হইতে যারা সুস্বাদু ভাবিয়া।
* * লালা পিয়ে নয়ন মুদিয়া॥
নিত্যানন্দ ভুলে, তাতে আনন্দ যাহার।
ধিক্ সে পামরে, জন্ম বৃথাই তাহার॥
* * * গৌরাঙ্গ আমার।
তেয়াগিয়া তাঁর সঙ্গ লইব সংসার॥"

ভগবানের কৃপা, ভক্তানুগ্রহ ও নিজের ভজন এই তিনটী জীবের পরিত্রাণের হেতু। গোবিন্দের কিসে কি হইল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহার বিচার করিবেন।

বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা।

(শেষ)

রমণীগণের উন্নতির চতুর্থ অন্তরায় সংকীর্ণতা। সে কালের খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের জননী, রাণী রাসমণি প্রভৃতি দয়া, মৈত্রী, সেবা, পরোপকার, জনহিতৈষণা প্রভৃতি মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাস স্বরূপ। তাঁহাদের উদারতা জগতের আদর্শস্থানীয়। সে সকল মহাপ্রাণা রমণী ব্যতীত অন্যান্য রমণীগণেরও এই সকল সদ্গুণ বহুল পরিমাণে ছিল। অতিথি-সেবা, প্রতিবাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, এবং বিপন্ন দরিদ্রদিগের প্রতি করুণা করিতে তাঁহারা কিরূপ অভ্যস্তা ছিলেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে কালে এ দেশের একান্নভুক্ত পরিবারের ফলেই প্রধানতঃ এই সকল সদ্গুণ স্ত্রীজাতির অভ্যস্ত হইত। কলহাদির আশঙ্কা থাকিলেও বহু লোক একত্রিত থাকিলে পরার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগ, মানবের শীঘ্রই আয়ত্ত হইয়া থাকে। এখনকার কালে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, একান্নভুক্ত বহু পরিবার প্রায়ই দেখা যায় না। সুতরাং একালে মহিলাগণ পিতৃগৃহে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি, শ্বশুরগৃহে স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি, স্বামী উপার্জ্জন-ক্ষম হইলে কেবল স্বামী ও সন্তান*, এরূপ সকল স্থানেই বিশেষ কয়টী আত্মীয়ের সহিত বাস করাতে তাঁহাদের অনেকের পরার্থপরতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মানবহৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল অনুশীলনে যেরূপ সম্প্রসারিত হয়, অননুশীলনে সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই জন্য এখনকার অনেক বঙ্গীয় মহিলার মনের অবস্থা এত সঙ্কীর্ণ যে, পরের সুখের জন্য কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না†। সঙ্কীর্ণতা মনুষ্য-

* স্বামী উপার্জনক্ষম হইলে তাঁহার কর্ম্মস্থানে সাধারণতঃ স্ত্রী ও সন্তানের অধিকার হইয়া থাকে। স্থলবিশেষে পুত্রের কর্ম্মস্থলে মাতাপিতা'রও অধিকার হয়।

† বঙ্গ রমণীর সঙ্কীর্ণতার বিষয় "দুইটী প্রবন্ধ" পুস্তকে "সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য"

জীবনের উন্নতির পরিচায়ক নহে—অবনতির প্রধান লক্ষণ। সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে নারী-জীবনের উন্নতি নাই। সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিবার জন্ত রমণী দয়া ও সহানুভূতি অনুশীলন করিবেন। দয়া ও সহানুভূতি অনুশীলিত হইলে পরোপকার ও স্বার্থত্যাগ করিতে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মিবে।

রমণীদিগের উন্নতির পঞ্চম অন্তরায় অলসতা। সে কালে ভারত-মহিলাগণ ঢেঁকিতে ধান ভানিতেন, চর্কায় সুতা কাটিতেন, সংসারের সকল রকম কাজই আপনাদের হাতে করিতেন। কিন্তু এত কাজের উপরেও তাঁহারা তৎকাল-প্রচলিত শিল্প ও কারুকার্য্য করিতে সময় পাইতেন। ইহার কারণ তাঁহাদের নিরলসতা—শ্রমশীলতা। আর এখনকার কালে চাকর, ঝি, রাঁধুনী প্রভৃতির কল্যাণে গৃহকর্ম্ম যতই কমিয়া যাইতেছে, গৃহলক্ষ্মীদিগের সময়েরও ততই টানাটানি হইতেছে। গৃহস্থ-ঘরে প্রায়ই দেখা যায়, জিনিস পত্রের ছড়াছড়ি, ঘরের কোণে ময়লা জমিয়া আছে, খোকা বর্ষার দিনে খালি গায়ে বেড়াইতেছে, বাবু আপিসে যাইতে পারিতেছেন না, ভাত হইতে বড় বিলম্ব হইতেছে; এ সকল অসুবিধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নব্যা গৃহিণী উত্তর দিবেন "আমার বাড়ীর লোকগুলা বড় বেগোছ, তাই এমন হ'ল।" প্রকৃত পক্ষে তাঁহারই আলস্য এ সকল অসুবিধার মূল কারণ। খোকার গায়ে যখন জামা দেওয়া দরকার, তখন তিনি দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া রামার মা'র সহিত গল্প করিতে বসেন; যখন ঘর পরিষ্কার করা দরকার, তখন তিনি সমবয়স্কার সহিত তাস খেলিতে বসেন; যখন বাবুর ভাত হওয়া দরকার, হয় তো তখন তিনি একটুকরা সাবান লইয়া জামা কাচিতেই বসেন! এ রকম "বেগোছ" হওয়ার একমাত্র কারণ বঙ্গমহিলার আলস্যপ্রিয়তা। আলস্যের জন্যই, যে রমণী লেখা পড়া করেন তিনি সংসারের কাজ করিতে অশক্তা, যিনি গৃহকর্ম্ম করেন তিনি লেখা পড়া করিতে অশক্তা হইয়া পড়েন। এ দিকে বঙ্গবাসিনী দিনের বেলায় ঘুমাইতে পারেন, সমবয়স্কার সহিত তাস খেলিতে, গল্প করিতে পারেন, অসময়ে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে পারেন, কেবল নিজের প্রতি ও অন্যের প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য, তাহাই পালন করিতে পারেন না! তাহাতেই "সময়ের অভাব" ঘটে।

যাঁহারা অলসতাকে এতদূর প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের উন্নতি যে কত দূরে, তাহা কিছুই বলিতে পারা যায় না। ভারত-মহিলাগণ যদি অলসতা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হন, যিনি যতই চেষ্টা করুন, তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ উন্নতি কখনই শীঘ্র সাধিত হইবে না। এক এক জন ইউরোপীয় মহিলার নিরলসতা ও শ্রমশীলতার বিষয় আলোচনা করিলেও

প্রস্তাবে বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছি। বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে ক্ষান্ত রহিলাম।

চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহারা অনেকে গৃহের নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত পোষাক সেলাই, কাপড় ধোলাই পর্য্যন্ত করিয়া জ্ঞানানুশীলন ও সমাজহিতৈষণা বিষয়ে যোগ দান করিতে পারেন। এ রকম নিরলস ও শ্রমশীল না হইলে কেহ কি বাস্তবিক উন্নতি করিতে পারে? আর এক কথা এই যে, যাঁহারা শ্রমশীলতা ও গৃহকর্ম্ম-নিপুণতায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণার সন্তান বলিয়া গৌরবান্বিতা, সেই প্রাচীনা মহিলাগণের শোণিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আলস্য-পরায়ণা, গৃহকর্ম্মে অনভিজ্ঞা ও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টা হইবার মত অবনতি বঙ্গ-মহিলার জীবনে আর কি আছে? তাই বলিতেছি, স্বদেশীয়া ভগিনি! তোমার নিজের জন্য, তোমার পরিজনের জন্য, আর তোমার জাতীয় জীবনের জন্য তোমাকে আলস্য ছাড়িয়া দিতে হইবেই হইবে। এই আপদ্ দূর হইলে তোমার উন্নতি-পথের এক বড় বাধা কাটিয়া যাইবে।

রমণীগণের উন্নতির ষষ্ঠ অন্তরায় বিলাসিতা। সে কালের মহিলাগণের অবস্থা আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিলাসিতা দেশী জিনিস নহে, জাহাজে চড়িয়া এ দেশে আসিয়াছে। "সভ্যতা" শিখিতে গিয়া এ দেশের লোক বিলাসিতা গ্রহণ করিয়া প্রতারিত হইতেছেন। বঙ্গবাসিনীদিগের এই রোগ বড়ই প্রবল হইয়াছে। আতর, গোলাপ, ল্যাবেণ্ডার, অডিকলন পর্য্যন্ত উঠিয়াই এ রোগ ক্ষান্ত হয় নাই; এখনকার দিনে যে মধ্যবিত্ত রমণীরাও সংসারের কাজ করিতে বিরক্ত হন, যাঁহার মাসে দশ টাকা আয় তাঁহার যে পঁচিশ টাকা ব্যয় করিতে হয়, সেও এই পোড়া বিলাসিতা রোগের জন্য। যে নির্ধনতা হইতে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতেছে, সেই নির্ধনতার এক প্রধান কারণ বিলাসিতা। তদ্ভিন্ন, বিলাসী ব্যক্তি আপনার সাজ গোজ করিতেই ব্যস্ত থাকে, জগতে কোনও উচ্চতর কার্য্য করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না; যে আপনাকে লইয়াই ষোল আনা বিব্রত, সে অন্য বিষয়ে মনোযোগ করিবে কি করিয়া? তাই বলিতেছি "বিলাসিতা" বঙ্গ-রমণীর উন্নতির পথে বড় এক বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার স্বদেশীয়া ভগিনীগণ যদি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্টা হইতে পারেন, যদি বিলাসিতার নীচত্ব বুঝিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলেই এ বিদেশীয় রোগ দূরীভূত হয়—বঙ্গ-মহিলার উন্নতির পথ সুগম হইতে পারে।

রমণীগণের উন্নতির সপ্তম অন্তরায় বর্ত্তমান সময়ে বিবাহার্থী যুবকের অর্থ-লালসা। এই দুর্ঘটনা স্ত্রীজাতির উন্নতির পক্ষে যে কি দারুণ বিঘ্ন হইয়া আছে, সে বিষয় দেশের অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। তখনকার দিনে যে কন্যা-পণ প্রচলিত ছিল, এখনকার বর-পণের তুলনায় তাহা হারিয়া গিয়াছে; কারণ কন্যা-পণ হইতে বর-পণ অধিকতর ব্যয়-সাপেক্ষ। আর এক কথা—কন্যাপণের দায়

হইতে কেহ কেহ নিষ্কৃতিও লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু বর-পণের দায়ে প্রায় সকলেই দায়ী। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের ভাগ্যে উপার্জ্জন করিয়া ধনলাভ সকল সময়ে হয় না, কিন্তু বিবাহের সময়ে পত্নীর পিতৃকুল হইতে তিনি জীবনের সংস্থান করিতে চাহেন। ইহাতে দরিদ্র—দরিদ্র কেন, মধ্যবিত্ত লোকদিগেরও সুশিক্ষিত পাত্রে কন্যা দান করা অনেক সময়ে "সাধ্যাতীত"হইয়া পড়িয়াছে। পিতার অর্থের জোর না থাকাতে অনেক সুপাত্রীকে অপাত্রে সম্প্রদান করিতে হইতেছে! ইহা যে নারী-জীবনের কতদূর অনিষ্টকর, তাহা যাঁহাদের হৃদয় আছে, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, ইহা হইতে বাল্যবিবাহও প্রশ্রয় পাইতেছে। ছেলে যত উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে থাকে, তাহার মূল্যও তত অধিক হইতে থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালককে যে পরিমাণে টাকা দিতে হয়, এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে অনেক সময়ে তাহার দ্বিগুণ টাকা দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই কারণে এ দেশের বালকেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ বিবাহের জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। এই জন্যই কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত পুরুষদিগকে অতি অল্প বয়সেই সংসারে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই জন্যই বঙ্গবাসিনীগণ জন্মগ্রহণ করিলে আতঙ্কে মাতা পিতার রক্ত শুকাইতে থাকে! কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত অভিভাবকদিগের প্রাণে অসহ্য বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে! যত দিন এই কুপ্রথা দূর না হইবে, ততদিন এ দেশের স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কখনই সাধিত হইবে না। কিন্তু প্রজা-হিতৈষী বৃটিশ-রাজ এ বিষয়ে দৃষ্টি না করিলে, ভারত-বাসিগণ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া যে এ কুপ্রথা রহিত করিতে পারিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। সে জন্য এই বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা স্বদেশহিতৈষিগণের কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ হয়।

স্ত্রীজাতির উন্নতিপথের এই সকল বিঘ্ন দূর হইলে তাঁহাদিগের অবস্থা অধিকতর উন্নত হইতে পারে। এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

উপসংহার-সময়ে বলি, ভারত-মহিলাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি যে এখনও কত দূরে আছে, তাহা আমি জানি না—কিন্তু যে সর্ব্বশক্তিমান্ দেব-দেবের প্রসাদে বিগত শত বর্ষে তাঁহাদিগের অবস্থা এরূপ অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, ভারতের গাঢ় নিদ্রা ভাঙিয়াছে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময়ের চরণে প্রার্থনা করি, ভারত-মহিলাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ নিকটস্থ হউক, ভারত-সমাজ প্রকৃত সম্পূর্ণতা লাভ করুক; বামাহিতৈষিগণের আশা সফল হউক; আর ভারত-জননী—অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতী

প্রভৃতি কন্যারত্ন-প্রসবিনী ভারত-জননী আবার কন্যারত্ন প্রসব করুক; সুপুত্র সুকন্যার গৌরবে মা আবার রাজ-রাজেশ্বরী হইয়া সন্তানের চক্ষে প্রকাশিত হউক, সেই মঙ্গলময় দেবতার মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমাদিগের সকল নর নারীর জীবন উৎসর্গীকৃত হউক।

বঙ্গাব্দ ১৩০০। ভাদ্র। শ্রীমানকুমারী বসু।

ভক্তি-উপহার।*

১

তোরা কি বলিস্ কিসে,
আমি জানি মরেনি' সে,
স্বরগের ছেলে গেছে স্বরগে চলিয়া;
ফুলের আতর সম,
কীর্ত্তি তার নিরুপম,
ভারতের বুকে বুকে রয়েছে জাগিয়া!

২

ভারত-হিতার্থী যারা,
কখ'ন বলোনা তারা,
"সে ছিল পরের ছেলে পর একজন"
বলিও "সে মহামূল্য,
কোটি কোহিনুর তুল্য,
বলিও "সে ভারতেরি অমূল্য রতন।"

৩

সেই শূর—শূরবর,
ছাড়ি দেশ, বাড়ী ঘর,
আপনা ঢালিয়া দিলা ভারত-পূজায়;
বুকের রুধির মরি!
প্রীতির অঞ্জলি করি,
দিয়েছিল উপহার ভারতের পা'য়!

৪

বিজাতি বিদেশী জ্ঞান,
মনে না পাইল স্থান,
ভারত-কুমার তার প্রিয় পরিজন;
মমতা যতন কত,
করিলা সে অবিরত,
"সহোদর ভাই" ব'লে দিলা আলিঙ্গন!

৫

আর—

দুখিনী ভারত কন্যা;
ধরাতলে নহে গণ্যা,
খায় দায় কাজ করে পশুর মতন;
পশু সম অবজ্ঞায়,
দলিতা নরের পা'য়,
সভ্যতা, উন্নতি, সত্য, বোঝে না কখন!

৬

সে নির্ব্বোধ নিরক্ষরা,
সেই সব বেঁচে-মরা,
তারাই জননী বোন, তারাই রমণী;
পুরুষেরা লেখে পড়ে,

* ভারত-হিতৈষী মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ৪৪ সাংবৎসরিক স্বর্গারোহণ-দিন স্মরণার্থ গত ১২ই আগষ্ট সমাধিস্থলে পঠিত।

তত্ব শেখে, সভা করে,
কিন্তু সেই "পশুগুলা," তাদের ঘরণী!

৭

সেই সব অভাগীর,
তপ্ত নয়নের নীর,
হেরিয়া অনাথ-নাথ হ'য়ে সকরুণ,
অনায়াসে করি পার,
সুবিশাল পারাবার,
আনিলা ভারতে, নর-দেবতা বেথুন।

৮

সে মহা-মহিমাময়,
দরশনে পাপক্ষয়,
অটল রজত-গিরি পবিত্র আকার;
ভারত-বালার দুখে,
বাজিল কোমল বুকে,
সহস্র ধারায় চোখে, বহে জল-ধার!

৯

জলদ-নিঃস্বন-রবে,
উচ্ছ্বাসে কহিলা তবে,
ভারতের সারা বক্ষ করি উচ্ছ্বসিত;—
"রমণী, আনন্দ-হেতু,
জাতীয় উন্নতি-সেতু,
প্রেমময়ী বিশ্বমা'র প্রেমে নিরমিত!

১০

"নারীরে সুশিক্ষা দিলে,
জাতীয় কল্যাণ মিলে,
পুরুষে জীবন পায় নারীর শোণিতে;
যে চাও দেশের হিত,
স্বজাতি-মঙ্গলে প্রীত,
সে এস জীবন দিতে রমণীর হিতে!"

১১

শুনি সে অমিয় গাথা,
কত কোটী কোটী মাথা,
অদম্য উদ্যমভরে, অসীম উৎসাহে,
নীচতা হীনতা ভুলি,
দেখিল নয়ন তুলি,
নারীই জননী, বোন, জায়া, সুতা তাহে!

১২

আনন্দে চলিলা বালা,
বেথুনের পাঠশালা,
সাদরে সে ঋষিবর করিলা গ্রহণ;
দুখিনী মায়ের কন্যা,
নারীকুলে নহে গণ্যা,
দিল তারে পিতৃস্নেহ, ভ্রাতার যতন!

* * *

১৩

সেথা—
আজি নারী লেখে পড়ে,
বি, এ, এম, এ পাশ করে,
অদৃষ্ট ফিরিয়া গেছে, আজি শুভ দিন!—
ঢালে যদি রক্ত-ধার,
হৃদি পিণ্ডে গাঁথে হার,
পারে কি শুধিতে তা'রা বেথুনের ঋণ?

১৪

দেবতুল্য পূজ্যতম,
স্নেহে জননীর সম,
উপকারী শুভাকাঙ্ক্ষী জনক-মতন;
প্রণাম করিতে তাঁয়,
পরাণ আরাম পায়,
কে জানে কিসের স্রোতে উথলে নয়ন!

১৫

আহা!
সারা দিনমান-শেষে,
শ্রান্ত পরিশ্রান্ত বেশে,
শুয়েছে সোণার খাটে উজ্জ্বল তপন!—
আয় ভাই, বোন আয়,
কে দিবি সে রাঙা পায়,
পুষ্পাঞ্জলি—সূর্য্য-অর্ঘ্য মনের মতন!

১৬

তোরা কি বলিস্ কিসে,
আমি জানি মরেনি' সে,
স্বরগের ছেলে আছে, স্বরগে বসিয়া;
কিবা তাঁরে দিতে পারি,
দু ফোঁটা নয়নবারি,
পবিত্র শ্মশানে তাঁর যেতেছি রাখিয়া।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

রত্ন।

আমাদের অনেক পাঠিকা, বোধ হয়, রত্ন ভালবাসেন। বস্তুত যাঁহারা অলঙ্কারকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহারা যে রত্নের আদর করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রত্ন কোথায় জন্মে, এবং কি প্রকারে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা তাহা আমাদের অলঙ্কার-প্রিয় পাঠিকাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট, সেইটীই রত্ন। যথা স্ত্রীরত্ন, পুরুষরত্ন, অশ্বরত্ন, ধনরত্ন ইত্যাদি।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষতে।

মণিবিশেষের সহিত রত্নশব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে।

"রত্নস্তু মণিভেদে স্যাৎ।"

রত্নপদবাচ্য যত প্রকার মণি আছে, তন্মধ্যে নয়টী প্রধান।

"মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যো গোমেদোবজ্রবিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমং॥"

অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত এবং নীল, এই নয় প্রকার রত্ন।

১ম-মুক্তা।

মুক্তা বহুমূল্য রত্ন। ভারতবাসিগণের ন্যায় ইউরোপীয়গণও প্রাচীন কাল হইতে ইহার বিশেষ আদর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বকালে রোমকগণ ইহা বহুব্যয়ে ক্রয় করিতেন। এক জন রোমক গ্রন্থকার তাঁহার সময় এক ছড়া মুক্তাহার অষ্ট লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ রূপবতী ক্লিওপেট্রা আট লক্ষ সাত হাজার দুই শত নব্বই টাকা মূল্যের একটী মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করিয়াছিলেন এবং এতাদৃশ বহুমূল্য একটী মুক্তা দ্বিখণ্ড করিয়া রোমের প্রসিদ্ধ দেবতা ভিনসের মূর্ত্তির কর্ণাভরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মিসরদেশীয় এক রাণীর কর্ণাভরণে একটী মুক্তা ছিল, এক সময়ে উহা

ইউরোপে ১৬ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে তৎসমক্ষে সার টমাস গ্রেসাম একটী দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করতঃ স্পেনদেশীয় রাজদূতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মুক্তা এইরূপ সকল সময়ে ও সকল রাজ্যেই আদৃত হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহার সমধিক গৌরব দৃষ্ট হয়। মুক্তাধারণে মহাফল, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র।

বৈদ্যক শাস্ত্রকারেরাও ইহার গৌরব করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার গুণ এবং ঔষধে উপযোগিতা ও উপকারিতা রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে বিবৃত আছে।

মুক্তার ছায়া বা কান্তি, বিশেষ বিশেষ আকর বা উৎপত্তিস্থান ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা গরুড়পুরাণে আছে, কিন্তু ভোজরাজ-কৃত "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মুক্তার আকর বা উৎপত্তিস্থান, যথা—

"মাতঙ্গোরগমীনপোত্রি-
শিরস্ত্বক্সারশঙ্খাম্বুভৃ-
চ্ছুক্তীনামুদরোদ্ভ মৌক্তিক-
মণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা ॥"

(১) মাতঙ্গ—হস্তী, (২) উরগ—সর্প, (৩) মীন—মৎস্য, (৪) পোত্রী—শূকর, (৫) ত্বক্‌সার—বাঁশ, (৬) শঙ্খ—শাঁখ, (৭) অম্বুভৃৎ—মেঘ, (৮) শুক্তি—ঝিনুক। গজমুক্তা, ফণীর মণি, বংশলোচন ইত্যাদি কথা ইহা হইতেই প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)।

নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

(১)

এক বৎসরের উপর হইতে চলিল বামাবোধিনীতে নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা হইয়াছিল। বালক-বালিকাদের নীতিশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে গুটিকতক স্থূল স্থূল কথা বলা মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মনে করিয়াছিলাম, পাঠক-পাঠিকার এ বিষয়ে মন আকৃষ্ট হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাশয় নীতিশিক্ষা বিষয়ে আরও কিছু লিখিতে অনুরোধ করায় এই প্রবন্ধ লেখা গেল।

(২)

সঙ্গের উপর ছেলেদের নীতি অনেকটা নির্ভর করে। "সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ" আমাদের মধ্যে এই কথা অনেক দিন হইতে প্রচলিত। কাহাকেও ইহার অর্থ বুঝাইবার দরকার নাই। সৎসঙ্গের গুণ ও অসৎসঙ্গের দোষ বোধ হয় এত অল্প কথায় ইহা অপেক্ষা আর ভাল করিয়া বুঝান যায় না। বড় হইলে লোকের মনোবৃত্তি সকল, ভালই হউক আর মন্দই হউক, এক প্রকার পরিপক্ব হইয়া যায় এবং তাহারা তাহাদের

সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে ও লয়। ছেলেবেলায় সাধারণতঃ আমরা তাহা পারি না। যেরূপ সঙ্গী পাই, তাহারই সঙ্গে মিশি। ছেলেরা অসৎ-সঙ্গে মিশিলে তাহার যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা অনেক পিতা মাতার অবিদিত নাই। ছেলে মেয়েকে মানুষ করা কি কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই জানেন। যদি প্রথম হইতে তাহাদের সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের উপর দৃষ্টি না রাখা যায়, তাহা হইলে ছেলে মেয়েকে "মানুষ" করা কি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে ইহা বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক ভদ্রলোকের ছোট ছোট পুত্র কন্যারা, বিশেষতঃ পুত্রেরা রাস্তায় টোটো করিয়া বেড়াইতেছে, যেখানে সেখানে যাইতেছে, যাহার তাহার সঙ্গে মিশিতেছে। দেখিয়াও বারণ করিবার কেহ নাই। বাপের হয়ত ইচ্ছা নয়, ছেলে ওরূপ করিয়া বেড়ায়। জানিতে পারিলে হয়ত তাড়না করেন এবং সেই জন্যই হয়ত মা তাঁর নিকট ছেলের এই রূপ টোটো করিয়া বেড়ান গোপন করেন। ছেলে কেন, অনেক সময় আমি ভদ্রঘরের ছোট ছোট মেয়েগুলিকেও মফস্বলে এইরূপ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে সাধারণতঃ আমরা বড় অসাবধান। সাহেবদের দৃষ্টান্ত এ সম্বন্ধে অনুকরণীয়। কোনও ভদ্র সাহেব আপনার ছেলে মেয়েকে যার তার সঙ্গে মিশিতে দেন না।

এখন কথা হইতেছে, এ রোগের ঔষধ কি? কেহ কেহ বলিবেন, যখন যার তার সঙ্গে মিশায় পরিণাম এত মন্দ, তখন যতদূর পারা যায় ছেলে মেয়েকে বাড়ীর বাহির হইতে না দেওয়া ও কাহারও সঙ্গে না মিশিতে দেওয়া ভাল। যার তার সঙ্গে মিলিয়া কদর্য্য ভাষা শিক্ষা করা ও কদর্য্য ভাব গ্রহণ করা অপেক্ষা কাহারও সঙ্গে না মিশাই ভাল। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার। সঙ্গলিপ্সা মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা চরিতার্থ হওয়া চাই এবং চরিতার্থ না হইলে মনের পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব। পরস্পর মিলিতে না পাইলে অনেক সময় ছেলেরা মুস্‌ড়াইয়া যায় ও ক্রমে অসামাজিক হইয়া উঠে। আরও একটি কথা আছে—সুধু মিশা নয়, ছেলেদের খেলা করাও আবশ্যক। আমার বিবেচনায় দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে উপরি-উক্ত অভাব মোচন হইতে পারে:—(ক) যাহাতে বাটীর ছেলেরা পরস্পরের সহিত মিলিতে ও খেলা করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা; শুধু বন্দোবস্ত নয়, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া। (খ) পল্লীস্থ শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারগণের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া খেলা করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা। পাড়ার সকল ছোট বালক বালিকাকে যে এক সঙ্গে মিশিতে হইবেক, এরূপ বলিতেছি না, এবং অনেক সময় তাহা সম্ভবও নহে; কিন্তু প্রত্যেক প্রতি-

দেশের ছেলেদের পরস্পর যতদূর মিশা সম্ভব, ততদূর মিশা ভাল। নির্দ্দিষ্ট সময় বলিবার উদ্দেশ্য আছে। যদি বাড়ীর ছেলেরা সকল সময়েই এবাড়ী ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষু তাহাদের উপর থাকিতে পারে না। ওরূপ করা ও রাস্তায় টো টো করিয়া বেড়ানতে বিশেষ প্রভেদ নাই। আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। যদি তুমি বুঝ যে, কোন বাটীর কর্ত্তৃপক্ষদের বাটীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপর নজর নাই, এবং সেই কারণে ও অন্যান্য কারণে উহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে কখনই আপনাদের ছেলে মেয়েকে উহাদের সহিত মিশিতে দিও না। এরূপ করিতে হয়ত চক্ষুলজ্জা হইতে পারে, এরূপ করাতে লোকে তোমাকে গর্ব্বিত মনে করিতে পারে, কিন্তু দেখিও যেন চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিম্বা লোকের ভয়ে আপনার ছেলেদের মাথা খাইয়া বসিও না।

(৩)

একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে উপরে যাহা বলা হইল তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে। আজ কাল প্রায় সকল ভদ্রলোকেই ছোট বালক, এমন কি বালিকাদিগকেও বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া থাকেন। তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে মধ্যবিত্ত লোকের আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু বিদ্যালয় যে ছেলে বিগড়াইবার এক প্রধান আড্ডা ইহা বোধ হয় অনেকেই অস্বীকার করিবেন না। বিদ্যালয়ের উপকারিতা অনেক। ছেলের সঙ্গে মিশিয়া পড়া শুনা না করিলে, প্রতিযোগিতা-প্রবৃত্তি উত্তেজিত না হইলে পাঠার্থীদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ স্ফূরণ হয় না, মন সবল ও দৃঢ় হয় না, এবং বালক বালিকারা সামাজিক ধর্ম্ম ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যালয়-প্রণালীর গুণবর্ণনা করা আজ আমার অভিপ্রেত নহে, তাহার দোষ দেখানই উদ্দেশ্য। আজ কাল সাধারণতঃ আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজপ্রসাদে ও অর্থলালসা হেতু অনেক বিদ্যালয় হইতে ভদ্রাভদ্র প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেকে কোন বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইলে তাহার সহপাঠীরা কিরূপ, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অনেক স্থলে বিদ্যালয়ে কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্ত অপরিহার্য্য। পিতা মাতা মনে করেন, ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধন হইল। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা মনে করেন, কেবল পাঠ দেওয়া ও বেতন লওয়া অথবা শেষোক্ত কার্য্যটি মাত্র তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এইরূপ পদ্ধতিতে সমাজের যে কত অপকার হইতেছে, তাহা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কি ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইবে না, এবং বিদ্যালয় সকল কি উঠিয়া যাইবেক? আমি তাহা বলিতেছি না। ঘরে শিক্ষক রাখিয়া ছেলে

মেয়েকে লেখা পড়া শিখান সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় এবং সে প্রণালীর দোষও আছে। এ সম্বন্ধে আমি গুটি কতক কথা বলিব। আশা করি বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকারা তাহাদের প্রতি একটু মনোযোগ দিবেন। (১) বিদ্যালয় অনেক আছে, কিন্তু সকল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত সমান নয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ের রীতিনীতির প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখা হয় না। পিতা মাতার কর্ত্তব্য যতদূর সম্ভব নগরস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে ছোট ছোট পুত্র কন্যাদিগকে পাঠান। ইহাতে কিছু ব্যয়বাহুল্য হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ব্যয়ে কৃপণতা করা অন্যায়। অধিকাংশ স্থলে এরূপ ঘটে যে, পিতার যেরূপ আয় তাহাতে তাঁহার পক্ষে পুত্র কন্যাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে পাঠান এক প্রকার অসম্ভব। এরূপ স্থলে এই টুকুখানি করিতে বোধ হয় বিশেষ অসুবিধা না হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার ক্ষমতার ভিতর যে কয়টি বিদ্যালয় আছে, তাহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, সেইটিতে ছেলে মেয়ে পাঠান। (২) খুব শৈশবাবস্থায় ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠান কর্ত্তব্য নহে। যদি গৃহের বন্দোবস্ত ভাল হয় যদি পিতা মাতা ধর্ম্মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদিগকে গৃহে শিক্ষা দিলে তাহাদের চরিত্র এতটুকু গঠিত হইবার সম্ভাবনা যে, তার পর বিদ্যালয়ে গেলে তাহাদের চরিত্র শীঘ্র মন্দ না হইয়া যাইতে পারে। (৩) বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পরও ছেলে মেয়ের প্রতি খুব চক্ষু রাখা ও সর্ব্বদা তাহাদের তদারক করা আবশ্যক। অনেক পিতা মাতার বিশ্বাস যে, পুত্র কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। বাকি যাহা করা আবশ্যক, তাহা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কাজ ও কর্ত্তব্য। ইহাতে যে কি বিষময় ফল ফলে, তাহা অনেকে দেখিয়াও দেখেন না। (৪) বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই। যতদূর সম্ভব তাঁহাদের সকল ছাত্র ও ছাত্রীর প্রতি নজর রাখা উচিত এবং যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রী অত্যন্ত অলস ও অসচ্চরিত্র হয় ও তাহার সুধরাইবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে ভাল হয়। আজ কাল কিন্তু বিদ্যাদান একটা ব্যবসায়ের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে, এবং বোধ হয় আমার কথা অনেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের একটু তিক্ত লাগিবে। (ক্রমশঃ)

পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহা দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখী হইতে পারে। যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহা দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে।

ঈশ্বরের উপাসনা।

১। উপাসনা কেবল শুনিবার বা জানিবার কথা নয়, ইহা কাজে করিবার বিষয় এবং ইহার ফল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। শরীরের পক্ষে যেমন আহার, আত্মার পক্ষে তেমনি উপাসনা। আহার-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ১০খান প্রকাণ্ড পুস্তকে ধান্যবপন হইতে পরমান্ন প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত সকল বিষয় পাঠ করিলেও যেমন ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা একটুও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু দুটী মোটা চাউলের অন্ন পাইলেও তাহার উদর তৃপ্ত হয়; উপাসনা-স্থল বা শাস্ত্র হইতে গভীরতম তত্ত্বের কথা শুনিলেও সেইরূপ আত্মার অভাব পূর্ণ হয় না, কিন্তু প্রকৃত উপাসনার একটু আস্বাদন পাইলে আত্মার তৃপ্তি হয়। অন্ন হইতে শরীরের বল, বীর্য্য, শোভা, কান্তি, স্ফূর্ত্তি সকলই; উপাসনা দ্বারা আত্মারও সেইরূপ।

২। আহারের মূল যেমন ক্ষুধা, উপাসনার মূল তেমনি প্রাণের ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতার জন্যই নরনারী অতি বর্ব্বর অবস্থা হইতে অদ্যাপি নানা ভাবে ইষ্টদেবতাকে উপলব্ধি ও তাঁহার পূজা করিয়া আসিতেছে। আস্তিকতা আত্মার মূলগত বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস যত উজ্জ্বল হয়, তত সত্যভাবে ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। আর ভক্তি যত প্রগাঢ় হয়, তত তাহাতে প্রাণের আসক্তি হয়। ঈশ্বরকে কোন প্রকার দৃষ্টবস্তুরূপে দেখিলে সত্যরূপে তাঁহাকে দেখা হয় না। তিনি পরম চৈতন্য, পরমাত্মা। শরীরের অঙ্গভঙ্গী, মুখের কথা বা মনের কল্পনায় তাঁহার স্তবস্তুতি করিলে তাঁহার প্রকৃত পূজা করা হয় না; প্রাণের কথায়, প্রাণের যত্নে, প্রাণের আদরে প্রাণাসনে বসাইয়া প্রাণস্বরূপকে পূজা করিতে হয়।

৩। উপাসনার অর্থ—ঈশ্বরে বাস। যিনি তাঁহাকে লইয়া যত থাকিতে পারেন, তিনি তাঁহার তত প্রকৃত উপাসক। এই ব্রহ্মযোগ একই বস্তু, দুই ভাবে প্রকাশিত হয়—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপানে প্রাণ এক দিকে মগ্ন হয়; আর এক দিকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য—আপনার ও জগতের মঙ্গল-সাধনে আত্মার স্বাভাবিক গতি হয়। আত্মা যেমন রসস্বরূপ ঈশ্বর হইতে অমৃতরস গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ করে, সেইরূপ শরীর মন, হৃদয় ও বিবেককে তাঁহারই ভাবে পূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়। প্রকৃত উপাসকের নিকট উপাসনা জীবনের ক্ষণিক আংশিক কার্য্য নয়, কিন্তু ইহা সমগ্র-জীবনব্যাপী অবিশ্রান্ত সাধনার বিষয়। ব্রহ্মগতপ্রাণ হইয়া তিনি ব্রহ্মের উদ্দেশে সমুদায় কার্য্য সাধন করেন।

৪। উপাসনার দুই অঙ্গ হইলেও এক অঙ্গ মূল ও অন্য অঙ্গ শাখা প্রশাখা।

বৃক্ষের মূল গভীর ও অটলভাবে ভূমিতে বদ্ধ হইয়া তাহার রস শোষণ করে, শাখা পল্লব সকলই সতেজ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। আত্মা যদি অটল নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বরকে ধরিয়া ভক্তিরসে সিক্ত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান, ভাব, চিন্তা, কার্য্য সকলই পরিপুষ্ট হয়। বীরপুরুষ যেমন নিভৃত ব্যায়ামশালায় ব্যায়ামে অভ্যস্ত হইয়া রণক্ষেত্রে শূরত্ব প্রকাশ করেন, নির্জ্জনে গভীর উপাসনায় অভ্যস্ত হইয়া ধর্ম্মবীরও সেইরূপ কার্য্যক্ষেত্র সংসারে ধর্ম্মপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

৫। উপাসনার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই—যাহাতে আত্মা ঈশ্বরমুখী হয়, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। তবে সাধনার জন্য প্রথমে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। অঙ্গচালনা কর, বাচনিক বা মানসিক পূজা কর, ভক্তির উদ্দীপন হইয়া ভগবানের সহিত ভক্তের প্রাণকে যেন মিলিত করিয়া দেয়। শাস্ত্র পাঠ কর, নাম জপ কর, সাধুসঙ্গ কর, ব্রত উপবাস কর, সকলই যেন ভগবানের প্রতি মনকে অবনত ও সুস্থির করে। বৈষ্ণবেরা নবধা ভক্তিসাধনের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চৈব স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনা বন্দনা সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনম্॥"

ইষ্টদেবতার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার সেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, তাঁহার সহিত সখ্যভাব, তাঁহার আনুগত্য এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ এই নয়টী সাধনে পূজা পূর্ণাঙ্গ হয়।

ইহাঁরা শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার ভাবে ঈশ্বর-সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ ঈশ্বরকে নির্গুণ কারণ, প্রভু, সন্তান, সখা ও স্বামিভাবে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং এই সকল সাধনায় উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর, এই তাঁহাদের মত।

ব্রহ্মসাধক প্রাচীন ঋষিরা প্রাণায়মযোগে চিত্ত স্থির করিয়া অধ্যাত্মযোগে পরমাত্মাকে আত্মস্থ ও আত্মগত করিয়া তাঁহার সাধনা করিতেন। এই অধ্যাত্মযোগই সাধনার প্রকৃষ্ট উপায়।

৬। বাহ্যপ্রণালী সকল প্রাণহীন হইলে আড়ম্বরমাত্র সার হয়। এই জন্য সকল ধর্ম্মপ্রণালী বিকৃত হইয়াছে। তীর্থ, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি, প্রায়শ্চিত্ত, মালাজপ, করজপ, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন যোগ প্রাণহীন হইলে সকলই পণ্ডশ্রম সার হয়।

৭। উপাসনার ফলে জীবন মুক্ত হইবে। যত ব্রহ্মে আসক্তি বাড়িবে, ততই বিষয়ে বৈরাগ্য হইবে। প্রকৃত উপাসকের প্রাণ নিত্যযুক্ত সুতরাং নিত্যমুক্ত—সর্ব্বক্ষণ সচেতন, সর্ব্বক্ষণ প্রেমপূর্ণ, সর্ব্বক্ষণ পুণ্যকার্য্যে অনুরাগী। 'সত্যং শিবং সুন্দরং' দেবতাকে প্রাণের প্রিয়তম জানিয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করেন এবং তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার সেবায় জীবন সার্থক করেন।

কতকগুলি সুমাতা।

(গত প্রকাশিতের পর)

জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জননী।

প্রাতঃস্মরণীয়া জর্জ্জ ওয়াসিংটনের জননী একজন সুমাতা। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত সুসভ্য ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স প্রদেশে ভার্জিনিয়া নগরে এক সুসভ্য ইংরাজ পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। সদাচার, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, মিতব্যয়িতা, বিনয়, সত্যনিষ্ঠা এবং প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। তরু-লতা-সুশোভিত পর্ব্বতোপরি, কল-নাদিনী তরঙ্গিণীর তীরে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। সময়ে সময়ে পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন এবং প্রশান্ত নয়ন দুটী ভক্তি-অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া যাইত। তাঁহার স্বামীর যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি ছিল, সুতরাং মেরী ওয়াসিংটন ধনীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন; কিন্তু বিলাসিতা এবং অনর্থক অপব্যয়ে তিনি একটী কপর্দ্দকও কখন ব্যয় হইতে দেন নাই। মিতব্যয়িতা দ্বারা তিনি অর্থসঞ্চয় করিয়া নানারূপ দেশহিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেন এবং স্বহস্তে দীনদরিদ্র-দিগকে অর্থ দান করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন।

তাঁহার ছয় পুত্র, তন্মধ্যে জর্জ্জ ওয়াসিংটন তৃতীয়। জর্জ্জের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং পুত্রগণের লালন পালন ও শিক্ষার সম্যক্ ভার মেরী ওয়াসিংটনের উপরেই পতিত হয়। ছয়টী সন্তানের সুশিক্ষা বিধান একটী বিধবা রমণীর পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। মেরী ওয়াসিংটনকে তজ্জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত ও চিন্তিতথাকিতে হইত। তিনি বৃথা চিন্তার অভিভূত হইয়া এক মুহূর্ত্তও ব্যয় করিতেন না। সুনিয়ম ও সুশিক্ষা দ্বারা তিনি আপনার সদ্‌গুণ সকল সন্তান-দিগের প্রাণে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। জননীর সুশিক্ষার বলেই জর্জ্জ ওয়াসিংটন কালে প্রসিদ্ধ সেনাপতি ও জগদ্‌বিখ্যাত দেশহিতৈষী হইয়াছিলেন।

একদা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে জর্জ্জ ওয়াসিংটন সাত বৎসর মাতৃদর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র তিনি মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মেরী ওয়াসিং-টন বহুদিন পরে প্রিয় পুত্রকে সমাগত দেখিয়া পরমানন্দলাভ করিলেন এবং সহস্র সহস্র চুম্বন করতঃ শৈশবের প্রিয় নাম 'জর্জ্জি জর্জ্জি' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বতন ও আধুনিক সময়ের বন্ধুবর্গের সবিশেষ সংবাদ লইলেন এবং

শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু প্রিয়তম পুত্রের গৌরব ও পদমর্য্যাদার বিষয়ে একটী কথাও বলিলেন না। কেহ বলিলে বলিতেন "জর্জি ভাল ছেলে, সে ভাল কাজ করিবে জানি।"

অন্য এক সময়ে ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ তাহাদের নেতার জননীকে দেখিতে চাহিয়াছিল। সৈন্যগণ ভাবিয়াছিল জননী সমারোহের সহিত তাহাদিগকে দেখা দিবেন। কিন্তু সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, মেরী সামান্যবেশে তাঁহার প্রিয় পুত্রের বাহুমধ্যে মস্তক ন্যস্ত করিয়া উপস্থিত হইলেন। অহঙ্কার ও পদাভিমান তাঁহার উচ্চ হৃদয়ে স্থান পাইত না।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে পুত্রশোক ভোগ করিতে হয় নাই, অনতিবিলম্বেই তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রেসিডেণ্ট জাকসন এবং দেশের সমুদায় মান্যগণ্য লোক একত্র হইয়া ফেডারিক্সবর্গে তাঁহাকে মহাসমারোহে সমাহিত করেন। এই রমণীর বিষয়ে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুত্র জর্জ্জ ওয়াসিংটন বলিয়াছেন "আমার গৌরব ও মহত্ত্বের একমাত্র কারণ আমার জননীর সুশিক্ষা।"

সুশীলাবালা সিংহ।

ব্রতমালা।

হিন্দুরমণীর পক্ষে স্বধর্ম্মনিরতা, সদাচারনিষ্ঠা, স্বব্রতরতা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মশীলা পত্নীই পত্নী, অন্যে সে নামের যোগ্যা নহেন। যিনি পতিব্রতা, শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতির প্রতি তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। যাঁহারা পতির পূজ্য, তাঁহারা পতিব্রতারও পূজ্য। যাঁহারা পতির আত্মীয় স্বজন ও স্নেহভাজন, তাঁহারা পতিব্রতা পত্নীরও আত্মীয় স্বজন ও স্নেহভাজন। ওদিকে অন্যথা না হইলে ত আর এদিকে অন্যথা হইতে পারে না।

হিন্দুরমণী শৈশবাবধি মরণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপথে মন দিতে বাধ্য হন। বাল্যের অভ্যাস যৌবনে বদ্ধমূল হয়; তখন অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়। হিন্দুশাস্ত্রের মত শাস্ত্র, হিন্দুর শিক্ষার মত শিক্ষা অতি বিরল। ধর্ম্মের খেলাতেও ধর্ম্মশিক্ষা হয়। শৈশবের ব্রত পুণ্যপুকুর; কিন্তু বস্তুতঃই পুণ্যের পুকুর। এই খেলার পুকুরে যে পুণ্যশিক্ষা হয়, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তাহাই মহা পুণ্যকার্য্যে পরিণত হয়। বাল্যের যমপুকুরেই হিন্দুবালিকা ভবিষ্যতে যম জিনিবার উপায় শিক্ষা করেন। শৈশবরাজ্যের ক্রীড়া-ব্রতগুলি বড় অগ্রাহ্য নহে। যেমন বাল্যের বর্ণমালায় সকল বিদ্যার সূত্রপাত, বাল্যের ব্রতমালাতেও সেইরূপ

সর্ব্বধর্ম্মের সূত্রপাত। ব্রত হিন্দুনারীর সঙ্গের সঙ্গী। বাল্যে পুণ্যপুকুর, যমপুকুর, প্রভৃতি; যৌবনে ধনগছান, জলসংক্রান্তি, বৈশাখী চাঁপা প্রভৃতি; প্রাবীণ্যে অনন্ত-চতুর্দ্দশী, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী। বার্দ্ধক্যের ত কথাই নাই; তখন ধর্ম্মই হিন্দুরমণীর জীবনের একমাত্র কার্য্য।

হিন্দুর সকল কর্ম্মেই ধর্ম্মের বন্ধন, ধর্ম্মের সংস্রব,—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ধর্ম্মের বন্ধন। এমন বিধি ব্যবস্থা রীতি প্রথা আর কোনও জাতির মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুরমণী যে এত ধর্ম্মনিষ্ঠা, এত পতিব্রতা, এত সতী সাধ্বী, তাহা হিন্দুধর্ম্মের জন্য, হিন্দুশাস্ত্রের জন্য। ধর্ম্মে মতি আছে বলিয়াই হিন্দুরমণী গৃহের লক্ষ্মী, সংসারের দেবতা, সকলের পূজ্যা। ধর্ম্মের জন্যই পতিব্রতার তেজে জগৎ পরাজিত। অতএব পৌরাণিক প্রচলিত যে সকল ব্রতমালা পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠিকাগণের বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে, সেই সকল পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সুবুদ্ধি পাঠিকারা ইহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিবেন। ব্রত কত আছে, এক মাসের তালিকা দেখিলেই কতক বুঝা যাইবে :—

জন্মাষ্টমী ব্রত, তুলসী ব্রত, হরি-তালিকা ব্রত, ঋষি-পঞ্চমী ব্রত, কুক্কুটিব্রত, দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত, রাধাষ্টমী ব্রত, বুধাষ্টমী ব্রত, তালনবমী ব্রত, শ্রবণাদ্বাদশী ব্রত, বামন-দ্বাদশী ব্রত, এবং অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত এই কয়েকটাই ভাদ্রমাস-কৃত্য প্রধান ব্রত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মাসে প্রধান ও ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক ব্রত আছে। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

কর্ণ রোগ।

১। হড়হড়ের পাতার রস অল্প গরম করিয়া কর্ণের ভিতর দিলে তৎক্ষণাৎ কর্ণশূল (কান-কামড়ানি) নিবারিত হয়।

২। চামেলি ফুলের তৈল ২।১ ফোঁটা করিয়া ৪।৫ দিন কানে দিলে পূঁয পড়া ভাল হয়।

৩। ঈষদুষ্ণ নারিকেল তৈলে একটু আফিং মিশাইয়া কর্ণের মধ্যে দিলে কর্ণ-শূল ও তজ্জনিত যাতনা অবিলম্বে নিবারিত হয়।

৪। নারিকেল মুচি ছেঁচিয়া এই রস ঝিনুকে করিয়া কানে দিলে কান-পাকা ভাল হয়।

৫। পাকা আকন্দ পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহার রসে কর্ণ পূর্ণ করিলে, তীব্র কর্ণশূল সত্বর উপ-শমিত হয়।

৬। নীল বৃক্ষের মূলের রস কাঁজি ও তৈলের সহিত পাক করিয়া তাহাতে কর্ণ পূর্ণ করিলে কর্ণের কৃমী বিনষ্ট হয়।

৭। লসুন, আমলকী সমপরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ হরিতাল দিয়া পেষণ করিয়া চতুর্গুণ তৈলে পাক করিবে, পাককালে তৈলের চতুর্গুণ দুগ্ধ দিবে। যখন দুগ্ধ শেষ হইয়া তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন তৈল নামাইয়া ঐ তৈলে কর্ণ কিছুদিন পূর্ণ করিলে, বধিরতা রোগ বিনষ্ট হয়।

৮। শ্বেতসর্ষপ, বৃহতী, ও অপামার্গ সমপরিমাণে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া কর্ণে প্রলেপ দিবে। ইহাতে কর্ণ পালি বৃদ্ধি হয়।

হিন্দুগৃহিণীর রাজনীতি।

পল্লীতে ও গ্রামে পাকা গৃহিণী বলিয়া, হরিদাসবাবুর জননীর খুব সুখ্যাতি আছে। পল্লীবাসিনী স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে। একে ব্রাহ্মণের কন্যা, তাহাতে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীশ্বরের গৃহিণী; কেনই বা লোকে লক্ষ্মী বলিয়া ভক্তি না করিবে? ইহার উপর তাঁহার এত অসাধারণ গুণ ছিল যে, কেহই তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। কর্ত্তা পাঁচ শত টাকা পেন্‌সন্ পান; চারিটী পুত্র, তন্মধ্যে একটী ডাক্তার, একটী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; তাঁহারা দুই ভাইয়ে মাসে প্রায় হাজার টাকা ঘরে আনেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানি কাগজের সুদও কিছু আসে। আয় যেমন দেখিতেছ, ব্যয়ও তেমনি। পুত্র, পুত্রবধু, পৌত্র, পৌত্রী, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, দুই একটী জামাই, দুই একটী ভাগিনেয়, গৃহিণীর দুই একটী বিধবা ননন্দা এবং দাসদাসী ইত্যাদিতে দুই বেলায় প্রায় যাইট সত্তর খানি পাত পড়ে। অতিথিসেবার একটা প্রকাণ্ড আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু এমন দিন যায় না, যে দিন ২।৩টী অতিথির সেবা না হয়। এতদ্ব্যতীত নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও আছে। এক গৃহে বিভিন্ন প্রকৃতির এত লোক বাস করে, তবু কোন দিন কেহ একটী "টু" শব্দ শুনিতে পায় না। নিত্য নিত্য এত ব্যয় হয়, কিন্তু এক কপর্দ্দকও অপব্যয় হয় না। দৈনিক তিনটী অতিথির সেবা স্বতন্ত্র আয়োজন বিনা নির্ব্বাহিত হইয়া যাইত। অতিথি-সংখ্যা তদধিক হইলে পৃথক্ আয়োজন হইত। সংসারে এতাদৃশী সুশৃঙ্খলা কেবল গৃহিণীর গুণে। হরিদাস বাবুর মাতা বলিতেন, "যদি অতিথিসেবার জন্য গৃহস্থ পরিজনগণের আহারাদির একটু ত্রুটি না হইল, এবং পরিজনগণ যদি বুঝিতে না পারিলেন যে, তাঁহাদের গৃহে অতিথি আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের আহারাদির একটু ন্যূনতা হইয়াছে, তাহা হইলে আতিথ্যের ফল হয় না। যে ঘরে এরূপে অতিথিসেবা না হয়, সে ঘরে মিতব্যয়িতার নিয়ম সকলও উপেক্ষিত হইয়া থাকে।" অতিথিসেবা

সম্বন্ধে হরিদাসের মার আরও যে সকল কথা আমরা শুনিয়াছি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে তিনি যে আতিথ্যের একটা অদৃষ্ট বা অলৌকিক ফলের প্রত্যাশা করিতেন, এরূপও বোধ হয় না। তিনি বলিতেন,—"অতিথিসেবা গৃহস্থের একটা প্রধান ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয়। এই জন্য শিশুকাল হইতে গৃহস্থ বালকবালিকাদিগের এই অনুষ্ঠান অভ্যস্ত হওয়া উচিত।" তিনি যে এইরূপ উক্তিমাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা নহে; উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়ও দেখাইয়া দিতেন। যে দিন গৃহে অতিথি আসিতেন, সে দিন দুগ্ধপোষ্য শিশু ব্যতীত পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের ভাগের দুগ্ধ ও জলখাবার হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া অতিথিকে প্রদান করিতেন, এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, "আজ তোমাদের বাড়ী অতিথি ঠাকুর আসিয়াছিলেন বলিয়া তোমাদের দুগ্ধ জলখাবার একটু কম হইয়াছে।" তাহারা বাল্যকাল হইতে শিখিত আপনারা না খাইয়া, বা অল্প খাইয়া, অতিথিসেবা করিতে হয়।

হরিদাসের মা কখন দাসদাসীগণের উপর অতিথিসেবার ভার অর্পণ করিতেন না; তাঁহার অনুরোধে স্বয়ং কর্ত্তাকে গিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিতে ও সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। কর্ত্তা একদিন স্বয়ং অতিথির নিকট যাইতে একটু আপত্তি করায়, গৃহিণী বলিয়াছিলেন,—"দেখ কর্ত্তা! তুমি ভাব, এই ঘর-সংসার টাকা-কড়ি, সবই তোমার, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক, নয়? আমি কিন্তু সেরূপ ভাবি না; আমি ভাবি, পৃথিবীতে যত ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি, লোক জন আছে, সকলই একজনের;—সে সকলকে রক্ষা করে,—সকলকে প্রতিপালন করে। এইজন্য সকল সংসারে সকলের সম্বন্ধ আছে। আমার ইচ্ছা করে, অতিথিগণকে এমন যত্ন করি যেন তাঁহারা মনে করেন যে, 'এক বাড়ী ছাড়িয়া আর এক বাড়ী আসিয়াছি।' কি করিব, বিধাতা আমাকে তুমি না করিয়া তোমার নারী করিয়াছেন, বাহিরে যাওয়া ভাল দেখায় না।" কর্ত্তা সেই দিন হইতে আর কোনও কথা কহিতেন না;—অতিথি আসিবামাত্র অবিলম্বে নামিয়া আসিতেন।

(২)

আমরা যে হিন্দুগৃহিণীর আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি, তিনি গৃহলক্ষ্মীরূপে যে গৃহে অবস্থান করিতেন, সেই গৃহের পার্শ্বে হরিদাসনামক কোন ব্রাহ্মণযুবক সস্ত্রীক বাস করিতেন। প্রতিবেশী হরিদাস বালককালে গৃহিণীর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিদাস বাবুর সতীর্থ অর্থাৎ সহপাঠী ছিলেন; তদ্ভিন্ন নাম, বয়স ও আকৃতিগত সাদৃশ্য বশতঃ উভয়ের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। পুত্রের সুহৃৎ বলিয়া গৃহিণীও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুহৃদের জননী বলিয়া

প্রতিবেশী হরিদাসও গৃহিণীকে গর্ভধারিণী-বৎ ভক্তি করিতেন। বিশেষতঃ বালক-কালেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হওয়াতে এবং হরিদাসবাবুর পিতার অনুগ্রহে তাঁহার চাকুরী হওয়াতে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ও আনুগত্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু শৈশবে অভিভাবকহীন হইলে সচরাচর যৌবনে যে দোষ ঘটিয়া থাকে, প্রতিবেশী হরিদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়াছিল। তিনি সুরা ও তদানুষঙ্গিক কুক্রিয়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বড় লক্ষ্মী;—সেই সাধ্বী যুবতী তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল পতির প্রতি কিছুমাত্র অভক্তি প্রকাশ করিতেন না; বরং বিধিমতে তাঁহার চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। হরিদাসবাবু এখন ডেপুটী মাজিষ্টেট,—তাঁহার উচ্চপদ; সুতরাং দেশীয় প্রথা-মতে তিনি বাল্যবন্ধু গরিব হরিদাসের সংবাদ লইতে লজ্জাবোধ করিতেন। কর্ত্তা, "ছোঁড়া মদ, বেশ্যা ধরিয়া অধঃপাতে গিয়াছে" বলিয়া হরিদাসের মুখদর্শনও করিতেন না; কিন্তু গৃহিণী হরিদাসকে সমানই ভালবাসিতেন। তিনি একদিন হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন,—"হরি! চল্লিশ টাকা মাহিনা পা'স, খাইবার লোক তুই, তোর স্ত্রী ও একটী বিধবা বোন। বুঝিয়া চলিতে পারিলে খরচপত্র হইয়া তোর মাসে মাসে কিছু সঞ্চয় হইবার কথা; তা না হইয়া সকলই উড়াইয়ে দিস্—বাছারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না,—কখন তাদের পরনে একখানা আস্ত কাপড় দেখিলাম না। সে দিন বউমা আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া-ছিলেন, দেখিলাম,—কেবল দুই গাছি কড় ও সিঁথের সিঁদুরটুকু আয়তি-চিহ্ন রহিয়াছে,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে কত রূপ;—বোধ হইল যেন নির্ব্বাসিতা পঞ্চালদুহিতা অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। কহিলাম, হতভাগা এমন শরীরে দুখানা গহনা দেয় না! বৌমা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মা! আমার কপাল!" হরিদাস সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "মা, আর আমাকে তিরস্কার করিবেন না; আমি আস্‌চে মাস হইতে কিছু কিছু টাকা আপনার কাছে রাখিয়া দিব, আপনি তদ্দ্বারা বৌকে গহনা গড়াইয়া দিবেন," বলিয়া গৃহিণীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য, মাসে মাসে টাকা গচ্ছিত করা দূরে থাকুক, ইহার পর হরিদাস আর ৩। ৪ মাস গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। গৃহিণী বুঝিলেন, স্ত্রীর প্রতি হরিদাসের ভালবাসা থাকিলেও, স্ত্রীকে ভাল কাপড়, ভাল গহনা পরাইবার ইচ্ছা থাকিলেও, ইচ্ছা করিয়া দুরন্ত অভ্যাস ত্যাগ করা হরিদাসের সাধ্য নহে; তজ্জন্য একটু তদ্বির আবশ্যক।

(৩)

হরিদাসের সহিত কথোপকথনের ঠিক্ তিন মাস পরে এক দিন গৃহিণী এক জন স্বর্ণকারকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটুকুরা কাগজ এবং নগদ ও নোটে

৩০০৲ তিন শত টাকা গণিয়া দিলেন; পরে একখানি হাতচিঠায় রসিদ্ ষ্টাম্প দিয়া তাহাতে স্বর্ণকারের স্বাক্ষর লইলেন। স্বর্ণকার বিদায় হইল। এই সময়ে গৃহিণী উপর হইতে কর্ত্তার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে দেখিলেন, কর্ত্তা বারান্দার দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। অমনি দশন-দষ্ট-রসনায় ত্বরিতপদে কর্ত্তার নিকট গমন করিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইতে-ছিল?" গৃহিণী কহিলেন, "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়। আর কেহ জানে না জানে, তুমি জানিতে না পার, এই আমার ইচ্ছা ছিল।"

"ব্যাপারটা কি?"

"হরিদাসের স্ত্রীর জন্য পাঁচখানা গহনা গড়াইতে দিলাম।"

"বড় বউমার কোন্ পাঁচখানা গহনার অভাব ছিল, আমি ত তা জানি না।"

"বুড়া হইলে পুরুষ মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়, এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট্ বুড়াদিগকে আফিস হইতে তাড়াইয়া দেয়। আমি কি আমার হরিদাসের বউকে 'বড় বউমা' বলিতে জানি না?"

"ভাল! আমিই যেন বুড়া হইয়াছি, তুমিই কোন্ ষোলবছরী?"

"আমি ষোড়শী যুবতী নহি বটে; কিন্তু যুবতীর ন্যায় বুদ্ধি আছে।"

কর্ত্তা একটু রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বয়াটে মাতাল হরিদাসের বউকে তিন শ টাকার গহনা দিয়া সেই বুদ্ধি প্রকাশ করিলে না কি?"

"তুমি একটু পায়ের ধুলা দাও, তাহার জোরে অবশ্যই সেই বুদ্ধি ষোলকলা হবে," বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যত হইলেন। কর্ত্তা কহিলেন, "শুন, একটা কথা বলি! তুমি তিন শ টাকা দান করিবার পাত্রী নহ, তাহা আমি জানি; কিন্তু হরিদাসের মত লোকের নিকট হইতে কি ঐ টাকা ফেরত পাইবার প্রত্যাশা রাখ?"

কর্ত্তার মুখে এত কথা শুনিতে হইবে বলিয়াই গৃহিণী গোপনে কার্য্য সারিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার ঘরণী হইয়া অনেক টাকা করিয়াছি; না হয়, তিন শ টাকা যাইবে, তাহাতে মারা যাইব না। অথবা এককালে এজন্য হয়ত, তুমিই আবার অনেক প্রশংসা করিবে।"

গৃহিণীর বুদ্ধিশুদ্ধি ও চাল চলনে কর্ত্তার সবিশেষ আস্থা ছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে পরিস্ফুটরূপে কিছু বুঝিতে না পারিলেও ইহাতে গৃহিণীর একটা ভাল মতলব আছে, তাহা বুঝিলেন, আর কোন কথা কহিলেন না।

(ক্রমশঃ)।

স্বরসাধন-প্রণালী।

বাহার (ঝাঁপতাল)। গ ni (△ গ △ নি)

+। ।　৩॥　।△　০।△　।　১।　।।
ধ　প　ম　গ　গ　প　ম　প
অ-　চ-　ল　ঘ-　ন　গ-　হ　ন

+।　।△　৩॥　।　০　।　^　১।　।△　।
ম　গ　ম　ধ　প　সা　নি　সা·　নি　ধ
ভু-　ণ　গাও　তাঁ-　হা-　রি ;

+।　।△　৩॥　।　০।　।　১॥△　।
ধ　নি　সা·　ঋ·　ঋ·　সা·　নি　সা·
গাও　আ-　ন-　ন্দে　স-　বে　র-　বি

+।　।△　৩॥　০।　।　△　১।　।△　।
সা·　নি　ধ　প　সা·　নি　সা·　নি　ধ
চ-　ন্দ্র　তা-　রা।

+।　।　৩।△　৮　৮　৮　০।　।　১।△　॥
ধ　ধ　নি　সা·　ঋ·　সা·　সা·　সা·　নি　সা·
(১ম বার) স-　কল　ত-　রু-　রা-　জি　সা-　জি
(২য় বার) গা-　ও　জী　ব　জ-　ন্তু　আ-　জি
(৩য় বার) ম-　ম　হৃ-　দ-　য়　গাও　আ-　জি

+।△　।　৩।　॥　০।△।　১।△　।　△　।
নি　ঋ·　সা·　ঋ·　নি সা·　নি　সা·　নি　ধ
ফু　ল　ফ-　লে　গা-　ও　রে ;
যে-　-　আ-　ছ　যে　খা　নে,
মি-　লি-　য়া　স　ব　সা-　থে,

+।△　।△　৩।△　॥　০।△　।△　১।　॥
গ·　গ·　গ·　ম·　গ·　গ·　ঋ·　সা·
বি-　হ-　ঙ্গ　কু-　ল　গাও　আ-　জি
জ-　গৎ　পু-　র-　বা-　সী　স-　বে
ডা-　ক　না-　থ　ডা-　ক　না-　থ

+।　।△　৩॥　।　০।　।　△　১।　।△　।
সা·　নি　ধ　ধ　প　সা·　নি　সা·　নি　ধ
ম-　ধুর-　ত-　র　তা-　নে।
গা-　ও　অ-　সু-　রা　গে,
ব-　লি　প্রাণ　আ-　মা-　রি।